প্রবন্ধ

কৃষ্ণচরিত্র

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ষষ্ঠ খণ্ড

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

- প্রথম পরিচ্ছেদ–ভীষ্মের যুদ্ধ 2
- দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ–জয়দ্রথবধ 6
- তৃতীয় পরিচ্ছেদ–দ্বিতীয় স্তরের কবি 10
- চতুর্থ পরিচ্ছেদ–ঘটোৎকচবধ 15
- পঞ্চম পরিচ্ছেদ–দ্রোণবধ 19
- ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ–কৃষ্ণকথিত ধর্মতত্ত্ব 32
- সপ্তম পরিচ্ছেদ–কর্ণবধ 46
- অষ্টম পরিচ্ছেদ–দুর্যোধনবধ 50
- নবম পরিচ্ছেদ–যুদ্ধশেষ 58
- দশম পরিচ্ছেদ–বিধি সংস্থাপন 61
- একাদশ পরিচ্ছেদ–কামগীতা 64
- দ্বাদশ পরিচ্ছেদ–কৃষ্ণপ্রয়াণ 68

প্রথম পরিচ্ছেদ—ভীষ্মের যুদ্ধ

এক্ষণে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবে। মহাভারতে চারিটি পর্বে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। দুর্যোধনের সেনাপতিগণের নামক্রমে ক্রমান্বয়ে এই চারিটি পর্বের নাম হইয়াছে, ভীষ্মপর্ব, দ্রোণপর্ব, কর্ণপর্ব ও শল্যপর্ব।

এই যুদ্ধপর্বগুলি মহাভারতের নিকৃষ্ট অংশ মধ্যে গণ্য করা উচিত। পুনরুক্তি, অকারণ এবং অরুচিকর বর্ণনাবাহুল্য, অনৈসর্গিকতা, অত্যুক্তি এবং অসঙ্গতি দোষ এইগুলিতে বড় বেশী। ইহার অল্প ভাগই আদিমস্তরভুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কোন্ অংশ মৌলিক, আর কোন্ অংশ অমৌলিক, স্থির করা বড় দুষ্কর। যেখানে সবই কাঁটাবন, সেখানে পুষ্পচয়ন বড় দুঃসাধ্য। তবে যেখানে কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে কোন কথা পাওয়া যায়, সেই স্থান আমরা যথাসাধ্য বুঝিবার চেষ্টা করিব।

ভীষ্মপর্বের প্রথম জম্বুখণ্ড-বিনির্মাণ পর্বাধ্যায়। তাহার সঙ্গে যুদ্ধের কোন সম্বন্ধ নাই—মহাভারতেরও বড় অল্প। কৃষ্ণচরিত্রের কোন কথাই নাই। তারপর ভগবদ্গীতাপর্বাধ্যায়। ইহার প্রথম চব্বিশ অধ্যায়ের পর গীতারম্ভ। এই চব্বিশ অধ্যায় মধ্যে কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বিশেষ কোন কথা নাই। কৃষ্ণ যুদ্ধের পূর্বে দুর্গাস্তব করিতে অর্জুনকে পরামর্শ দিলে, অর্জুন যুদ্ধারম্ভকালে দুর্গাস্তব পাঠ করিলেন। কোন গুরুতর কার্য আরম্ভ করিবার সময়ে আপন আপন বিশ্বাসানুযায়ী দেবতার আরাধনা করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য। তাহা হইলে ঈশ্বরের আরাধনা হইল। যাহা বলিয়া ডাকি না কেন, এক ভিন্ন ঈশ্বর নাই।

তারপর গীতা। ইহাই কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান অংশ। এই গীতোক্ত অনুপম পবিত্র ধর্ম প্রচারই কৃষ্ণের আদর্শ মনুষ্যত্বের বা দেবত্বের এক প্রধান পরিচয়।

কিন্তু এখানে আমি গীতা সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। তাহার কারণ এই যে, এই গীতোক্ত ধর্ম একখানি পৃথক গ্রন্থে* কিছু কিছু বুঝাইয়াছি, পরে আর একখানি# লিখিতে নিযুক্ত আছি। গীতা সম্বন্ধে আমার মত এই দুই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

ভগবদ্গীতা-পর্বাধ্যায়ের পর ভীষ্মবধ-পর্বাধ্যায়। এইখানেই যুদ্ধারম্ভ। যুদ্ধে কৃষ্ণ অর্জুনের সারথি মাত্র। সারথিদিগের অদৃষ্ট বড় মন্দ ছিল। মহাভারতে যে যুদ্ধের বর্ণনা আছে, তাহা কতকগুলি দ্বৈরথ্যযুদ্ধ মাত্র। রথিগণ যুদ্ধ করিবার সময়ে পরস্পরের অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেন। তাহার কারণ, অশ্ব বা সারথি নষ্ট হইলে, আর রথ চলিবে না। রথ না চলিলে রথী বিপন্ন হয়েন। সারথিরা যোদ্ধা নহে—বিনা দোষে বিনা যুদ্ধে নিহত হইত। কৃষ্ণকেও সে সুখের ভাগী হইতে হইয়াছিল। তিনি হত হয়েন নাই বটে, কিন্তু যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবস মুহূর্তে বহুসংখ্যক বাণের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া ক্ষত বিক্ষত হইতেন। অন্যান্য সারথিগণ আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহারা বৈশ্য, জাতিতে ক্ষত্রিয় নহে। কৃষ্ণ, আত্মরক্ষায় অতিশয় সক্ষম, তথাচ কর্তব্যানুরোধে বসিয়া মার খাইতেন।

মহাভারতের যুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ইহা বলিয়াছি। কিন্তু একদিন তিনি অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু প্রয়োগ করেন নাই। সে ঘটনাটা এইরূপ:–

ভীষ্ম দুর্যোধনের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ করেন। তিনি যুদ্ধে এরূপ নিপুণ যে, পাণ্ডবসেনার মধ্যে অর্জুন ভিন্ন আর কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। কিন্তু অর্জুন তাঁহার সঙ্গে ভাল করিয়া স্বশক্তি অনুসারে যুদ্ধ করেন না। তাহার কারণ এই যে, ভীষ্ম সম্বন্ধে অর্জুনের পিতামহ, এবং বাল্যকালে পিতৃহীন পাণ্ডবগণকে ভীষ্মই পিতৃবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ভীষ্ম এখন দুর্যোধনের অনুরোধে নিরপরাধী পাণ্ডবদিগের শত্রু হইয়া তাহাদের অনিষ্টার্থ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন বলিয়া, যদিও ভীষ্ম ধর্মতঃ অর্জুনের বধ্য, তথাপি অর্জুন পূর্বকথা স্মরণ করিয়া কোন মতেই ভীষ্মের বধ সাধনে সম্মত নহে। এজন্য ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মৃদুযুদ্ধ করেন, পাছে ভীষ্ম নিপতিত হন, এজন্য সর্বদা সঙ্কুচিত। তাহাতে ভীষ্ম, অপ্রতিহত বীর্যে বহুসংখ্যক পাণ্ডবসেনা বিনষ্ট করিতেন। ইহা দেখিয়া এক দিবস ভীষ্মকে বধ করিবার মানসে কৃষ্ণ স্বয়ং চক্রহস্তে অর্জুনের রথ হইতে অবরোহণপূর্বক ভীষ্মের প্রতি পদব্রজে ধাবমান হইলেন।

দেখিয়া, কৃষ্ণভক্ত ভীষ্ম পরমাহ্লাদিত হইয়া বলিলেন,

এহ্যেহি দেবেশ জগন্নিবাস! নমোহস্তু তে শার্ঙ্গগদাসিপাণে।

প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ! রথোত্তমাৎ ভূতশরণ্য সংখ্যে ||

"এসো এসো দেবেশ জগন্নিবাস! হে শার্ঙ্গগদাখড়্গধারিন্! তোমাকে নমস্কার। হে লোকনাথ ভূতশরণ্য! যুদ্ধে আমাকে অবিলম্বে রথোত্তম হইতে পাতিত কর।"

অর্জুনও কৃষ্ণের পশ্চাদনুসরণ করিয়া, কৃষ্ণকে অনুনয় করিয়া, স্বয়ং সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া, ফিরাইয়া আনিলেন।

এই ঘটনা দুই বার বর্ণিত হইয়াছে, একবার তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে, আর একবার নবম দিবসের যুদ্ধে। শ্লোকগুলি একই, সুতরাং এক দিবসেরই ঘটনা লিপিকারের ভ্রম প্রমাদ বা ইচ্ছাবশতঃ দুই বার লিখিত হইয়া থাকিবে। সংস্কৃত গ্রন্থে সচরাচর এরূপ ঘটিয়া থাকে।

রচনা দেখিয়া বিচার করিলে, এই বিবরণকে মহাভারতের প্রথমস্তরভুক্ত বিবেচনা করা যাইতে পারে। কবিত্ব প্রথম শ্রেণীর, ভাব ও ভাষা উদার এবং জটিলতাশূন্য। প্রথম স্তরের যতটুকু মৌলিকতা স্বীকার করা যাইতে পারে, এই ঘটনারও ততটুকু মৌলিকতা স্বীকার করা যাইতে পারে।

এই ঘটনা লইয়া, কৃষ্ণভক্তেরা, কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে একটা তর্ক তুলিয়া থাকেন। কাশীদাস ও কথকেরা এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অবলম্বন করিয়া, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ভীষ্ম যুদ্ধারম্ভকালে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে—তুমি যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, এ যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে না, আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমাকে অস্ত্র ধারণ করাইব।

অতএব এক্ষণে ভক্তবৎসল কৃষ্ণ, আপনার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত করিয়া, ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন।

এ সুবুদ্ধিরচনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। ভীষ্মের এবম্বিধ প্রতিজ্ঞাও মূল মহাভারতে দেখা যায় না। কৃষ্ণেরও কোন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত হয় না। তাঁহার প্রতিজ্ঞার মর্ম এই যে—যুদ্ধ করিব না। দুর্যোধন ও অর্জুন উভয়ে তাঁহাকে এককালে বরণাভিলাষী হইলে, তিনি উভয়ের সঙ্গে তুল্য ব্যবহার করিবার জন্য বলিলেন, "আমার তুল্য বলশালী আমার নারায়ণী সেনা এক জন গ্রহণ কর; আর এক জন আমাকে লও।" "অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে

ন্যস্তশস্ত্রোহহমেকেতঃ” এই পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা। সে প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইয়াছিল। কৃষ্ণ যুদ্ধ করেন নাই। ভীষ্ম সম্বন্ধীয় এই ঘটনাটির উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে; কেবল সাধ্যানুসারে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে উত্তেজিত করা। ইহা সারথিরা করিতেন। উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল।

যুদ্ধের নবম দিবসের রাত্রিতেও কৃষ্ণ ঐরূপ অভিপ্রায়ে কথা কহিয়াছিলেন। ভীষ্মকে অপরাজিত দেখিয়া যুধিষ্ঠির নবম রাত্রে বন্ধুবান্ধবগণকে ডাকিয়া ভীষ্মবধের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, আমাকে অনুমতি দাও, আমি ভীষ্মকে বধ করিতেছি। অথবা অর্জ্জুনের উপরই এ ভার থাক; অর্জ্জুনও ইহাতে সক্ষম।

যুধিষ্ঠির এ কথায় সম্মত হইলেন না। কৃষ্ণ যে ভীষ্মবধ ইচ্ছা করিলেই করিতে পারিতেন, তাহা তিনি স্বীকার করিলেন। কিন্তু বলিলেন, “আত্মগৌরবের নিমিত্ত তোমাকে মিথ্যাবাদী করিতে চাহি না। তুমি অযুধ্যমান থাকিয়াই সাহায্য কর।” যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না। পরে কৃষ্ণের সম্মতি লইয়া, এবং অন্য পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া ভীষ্মের কাছে তাঁহার বধোপায় জানিতে গেলেন।

ভীষ্ম নিজের বধোপায় বলিয়া দিলেন। দৃশ্যতঃ সেইরূপ কার্য হইল। কার্যতঃ তাহার কিছুই হইল না। কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল—অর্জ্জুনই ভীষ্মকে শরশয্যাশায়িত ও রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। মূল মহাভারতের উপর দ্বিতীয় স্তরের কবি কলম চালাইয়া একটা সঙ্গতিশূন্য, নিষ্প্রয়োজনীয়, কিন্তু আপাতমনোহর শিখণ্ডীসম্বন্ধীয় গল্প খাড়া করিয়াছেন। কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই, এজন্য আমরা তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম না।

———————-

* ধর্মতত্ত্ব।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাঙ্গালা টীকা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—জয়দ্রথবধ

ভীষ্মের পর দ্রোণাচার্য সেনাপতি। দ্রোণপর্বে প্রথমে কৃষ্ণকে বিশেষ কোন কর্ম করিতে দেখা যায় না। তিনি নিপুণ সারথির ন্যায় কেবল সারথ্যই করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি যে কর্তা ও নেতা, এ কথাটা এখানে সত্য নহে। মধ্যে মধ্যে অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরকে সদুপদেশ দেওয়া ভিন্ন তিনি আর কিছুই করেন নাই। দ্রোণাভিষেক-পর্বাধ্যায়ের একাদশ অধ্যায়ে সঞ্জয়কৃত কৃষ্ণের বলবীর্য ও মহিমা কীর্তন জন্য এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাওয়া যায়। তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। এই অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ হয়, এবং কৃষ্ণের বলবীর্য ও মহিমা কীর্তনের মহাভারতে বা অন্যত্র কিছুই অভাবও নাই। আমরা তাঁহার মানবচরিত্র সমালোচনা করিতে ইচ্ছুক; মানবচরিত্র কার্যে প্রকাশ; অতএব আমরা কেবল কৃষ্ণকৃত কার্যেরই অনুসন্ধান করিব।

দ্রোণপর্বে প্রথম ভগদত্তবধে কৃষ্ণের কোন কার্য দেখিতে পাই। ভগদত্ত মহাবীর, পাণ্ডবপক্ষীয় আর কেহ তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিল না; শেষ অর্জুন আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগদত্ত অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে আপনাকে অশক্ত দেখিয়া, তাঁহার প্রতি বৈষ্ণবাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। অর্জুন বা অপর কেহই এই অস্ত্র নিবারণে সমর্থ নহেন; অতএব কৃষ্ণ অর্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া আপনি বক্ষে ঐ অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বক্ষে অস্ত্র বৈজয়ন্তী মালা হইয়া বিলম্বিত হইল।

এই অস্ত্র একটা অনৈসর্গিক অবোধগম্য ব্যাপার। যাহা অনৈসর্গিক তাহাতে আমরা পাঠককে বিশ্বাস করিতে বলি না এবং অনৈসর্গিকের উপর কোন সত্যও সংস্থাপিত হয় না। অতএব এ গল্পটা আমাদের পরিত্যাজ্য।

দ্রোণপর্বে, অভিমন্যুবধের পরে কৃষ্ণকে প্রকৃতপক্ষে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিতে পাই। যে দিন সপ্ত রথী বেড়িয়া অন্যায়পূর্বক অভিমন্যুকে বধ করে, সে দিন কৃষ্ণার্জুন সে রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহারা কৃষ্ণের নারায়ণী সেনার সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন–

ঐ সেনা কৃষ্ণ দুর্যোধনকে দিয়াছিলেন। এক পক্ষে তিনি নিজে, অন্য পক্ষে তাঁহার সেনা– এইরূপে তিনি উভয় পক্ষের সঙ্গে সাম্য রক্ষা করিযাছিলেন।

যুদ্ধান্তে ও দিবসান্তে শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণার্জুন অভিমন্যুবধ বৃত্তান্ত শুনিলেন। অর্জুন অতিশয় শোককাতর হইলেন।* যোগেশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং শোকমোহের অতীত। তাঁহার প্রথম কার্য অর্জুনকে সান্ত্বনা করা। তিনি যে সকল কথা বলিয়া অর্জুনকে প্রবোধ দিলেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত। গীতায় তিনি যে ধর্ম প্রচারিত করিয়াছেন, সেই ধর্মানুমোদিত মহাবাক্যের দ্বারা অর্জুনের শোকাপনয়ন করিলেন। ঋষিরা যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দিতেছিলেন, এই বলিয়া যে, সকলেই মরিয়াছে ও সকলেই মরিয়া থাকে। তিনি তাহা বলিলেন না। তিনি বুঝাইলেন।

"যুদ্ধোপজীবী ক্ষত্রিয়গণের এই পথ। যুদ্ধমৃত্যুই ক্ষত্রিয়গণের সনাতন ধর্ম।"

কৃষ্ণ অভিমন্যুজননী সুভদ্রাকেও ঐ কথা বলিয়া প্রবোধ দিলেন। বলিলেন,

"সৎকুলজাত ধৈর্যশালী ক্ষত্রিয়ের যেরূপে প্রাণপরিত্যাগ করা উচিত, তোমার পুত্র সেইরূপে প্রাণত্যাগ করিয়াছে; অতএব শোক করিবার আবশ্যিকতা নাই। মহারথ, ধীর, পিতৃতুল্যপরাক্রমশালী অভিমন্যু ভাগ্যক্রমেই বীরগণের অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাবীর অভিমন্যু ভূরি শত্রু সংহার করিয়া পুণ্যজনিত সর্বকামপ্রদ অক্ষয় লোকে গমন করিয়াছে। সাধুগণ, তপস্যা ব্রহ্মচর্য শাস্ত্র ও প্রজ্ঞা দ্বারা যেরূপ গতি অভিলাষ করেন, তোমার কুমারের সেইরূপ গতিলাভ হইয়াছে। হে সুভদ্রে! তুমি বীরজননী! বীরপত্নী, বীরনন্দিনী ও বীরবান্ধবা; অতএব তনয়ের নিমিত্ত তোমার শোকাকুল হওয়া উচিত নহে।"

এ সকলে মাতার শোক নিবারণ হয় না জানি। কিন্তু এ হতভাগ্য দেশে এরূপ কথাগুলা শুনি ও শুনাই, ইহা ইচ্ছা করে।

এদিকে পুত্রশোকার্ত অর্জুন অতিশয় রোষপরবশ হইয়া এক নিদারুণ প্রতিজ্ঞায় আপনাকে আবদ্ধ করিলেন। তিনি যাহা শুনিলেন, তাহাতে বুঝিলেন যে, অভিমন্যুর মৃত্যুর প্রধান কারণ জয়দ্রথ। তিনি অতি কঠিন শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পরদিন সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথকে বধ করিবেন, না পারেন, আপনি, অগ্নিপ্রবেশপূর্বক প্রাণত্যাগ করিবেন।

এই প্রতিজ্ঞায় উভয় শিবিরে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পাণ্ডবসৈন্য অতিশয় কোলাহল করিতে লাগিল, এবং বাদিত্রবাদকগণ ভারি বাজনা বাজাইতে লাগিল। কৌরবেরা চমকিত হইয়া অনুসন্ধান দ্বারা প্রতিজ্ঞা জানিতে পারিয়া জয়দ্রথরক্ষার্থে মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

কৃষ্ণ দেখিলেন, একটা বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। অর্জুন বিবেচনা না করিয়া যে কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন, তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়া সুসাধ্য নহে। জয়দ্রথ নিজে মহারথী, সিন্ধুসৌবীর–দেশের অধিপতি, বহু সেনার নায়ক এবং দুর্যোধনের ভগিনীপতি। কৌরবপক্ষীয় অপরাজেয় যোদ্ধৃগণ তাঁহাকে সাধ্যানুসারে রক্ষা করিবেন। এ দিকে পাণ্ডবপক্ষের প্রধান পুরুষেরা সকলেই অভিমন্যুশোকে বিহ্বল-মন্ত্রণায় বিমুখ। অতএব কৃষ্ণ নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কৌরবশিবিরে গুপ্তচর পাঠাইলেন। চর আসিয়া সেখানকার বৃত্তান্ত সব বলিল। কৌরবেরা প্রতিজ্ঞার কথা সব জানিয়াছে। দ্রোণাচার্য ব্যূহরচনা করিবেন; তৎপশ্চাৎ কর্ণাদি সমস্ত কৌরবপক্ষীয় বীরগণ একত্র হইয়া জয়দ্রথকে রক্ষা করিবেন। এই দুর্ভেদ্য ব্যূহভেদ করিয়া, সকল বীরগণকে একত্রিত পরাজিত করিয়া, মহাবীর জয়দ্রথকে নিহত করা অর্জুনেরও অসাধ্য হইতে পারে। অসাধ্য হয়, তবে অর্জুনের আত্মহত্যা নিশ্চিত।

অতএব কৃষ্ণ আপনার অনুষ্ঠেয় চিন্তা করিয়া, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। আপনার সারথি দারুককে ডাকিয়া কৃষ্ণের নিজের রথ, উত্তম অশ্বে যোজিত করিয়া, অস্ত্রশস্ত্র পরিপূর্ণ করিয়া প্রভাতে প্রস্তুত রাখিতে আজ্ঞা করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে, যদি অর্জুন এক দিনে ব্যূহ পার হইয়া সকল বীরগণকে পরাজয় করিতে না পারেন, তবে তিনি নিজেই যুদ্ধ করিয়া কৌরবনেতৃগণকে বধ করিয়া জয়দ্রথবধের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন।

কৃষ্ণকে যুদ্ধ করিতে হয় নাই, অর্জুন স্বীয় বাহুবলেই কৃতকার্য হইয়াছিলেন। কিন্তু যদি কৃষ্ণকে যুদ্ধ করিতে হইত, তাহা হইলে "অযুধ্যামানঃ সংগ্রামে ন্যস্তশস্ত্রোহহমেকতঃ" ইতি সত্য হইতে বিচ্যুতি ঘটিত না। কারণ যে যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা ঘটিয়াছিল, সে যুদ্ধ এ নহে। কুরুপাণ্ডবের রাজ্য লইয়া যে যুদ্ধ, এ সে যুদ্ধ নহে। আজিকার এ অর্জুনপ্রতিজ্ঞাজনিত যুদ্ধ। এ যুদ্ধের উদ্দেশ্যের ভিন্ন; এক দিকে জয়দ্রথের জীবন, অন্য দিকে অর্জুনের জীবন লইয়া যুদ্ধ। যুদ্ধে অর্জুনের পরাভব হইলে, তাঁহাকে অগ্নিপ্রবেশ করিয়া আত্মহত্যা করিতে

হইবে। এ যুদ্ধ পূর্বে উপস্থিত হয় নাই—সুতরাং "অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে" ইতি প্রতিজ্ঞা ইহার পক্ষে বর্তে না। অর্জুন কৃষ্ণের সখা, শিষ্য এবং ভগিনীপতি; তাঁহার আত্মহত্যানিবারণ কৃষ্ণের অনুষ্ঠেয় কর্ম।

ইহার পর কৃষ্ণ ও অপর সকলে নিদ্রা গেলেন। সেইখানে একটা আষাঢ়ে রকম স্বপ্নের গল্প আছে। স্বপ্নে আবার কৃষ্ণ অর্জুনের কাছে আসিলেন, উভয়ে সেই রাত্রে হিমালয় গেলেন, মহাদেবের উপাসনা করিলেন, পাশুপত অস্ত্র পূর্বেই (বনবাসকালে) অর্জুন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু আবার চাহিলেন ও পাইলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকল সমালোচনার নিতান্ত অযোগ্য।

পরদিন সূর্যাস্তের প্রাক্কালে অর্জুন জয়দ্রথকে নিহত করিলেন। তজ্জন্য কৃষ্ণের কোন সাহায্য প্রয়োজন হয় নাই। তথাপি কথিত হইয়াছে, কৃষ্ণ অপরাহ্নে যোগামায়া দ্বারা সূর্যকে আচ্ছন্ন করিলেন; জয়দ্রথ নিহত হইলে পরে সূর্যকে পুনঃপ্রকাশিত করিলেন। কেন? সূর্যাস্ত হইয়াছে ভ্রমে, জয়দ্রথ অর্জুনের সম্মুখে আসিবেন, এইরূপ ভ্রান্তির সৃষ্টির জন্য? এইরূপ ভ্রান্তিতে পড়িয়া জয়দ্রথ এবং তাঁহার রক্ষকগণ, উল্লসিত এবং অনবহিত হইবেন, ইহাই কি অভিপ্রেত? এইখানে কাব্যের এক স্তরের উপর আর এক স্তর নিহিত হইয়াছে স্পষ্ট দেখা যায়। এক দিকে দেখা যায় যে, এরূপ ভ্রান্তিজননের কোন প্রয়োজন ছিল না। যোগমায়াবিকাশের পূর্বেও অর্জুন জয়দ্রথকে দেখিতে পাইতেছিলেন, এবং তিনি জয়দ্রথকে প্রহার করিতেছিলেন, জয়দ্রথও তাঁহাকে প্রহার করিতেছিল। সূর্যাবরণের পরেও ঠিক তাহাই হইতে লাগিল। সূর্যাবরণের পূর্বেও অর্জুনকে যেরূপ করিতে হইতেছিল, এখনও ঠিক সেইরূপ হইতে লাগিল। সমস্ত কৌরবীগণকে পরাভূত না করিয়া অর্জুনকে জয়দ্রথকে নিহত করিতে পারিলেন না। আর এক দিকে এই সকল উক্তির বিরোধী, সূর্যাবরণকারিণী যোগমায়ার বিকাশ। এ ভ্রান্তিসৃষ্টির প্রয়োজন, পরপরিচ্ছেদে বুঝাইতেছি।

----

* এমনও পাঠক থাকিতে পারেন যে, তাঁহাকে বলিয়া দিতে হয় যে, অভিমন্যু অর্জুনের পুত্র ও কৃষ্ণের ভাগিনেয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—দ্বিতীয় স্তরের কবি

আমরা এত দূর পর্যন্ত সোজা পথে সুবিধামত চলিয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু এখন হইতে ঘোরতর গোলযোগ। মহাভারত সমুদ্রবিশেষ, কিন্তু এতক্ষণ আমরা, তাহার স্থির বারিরাশিমধ্যে মধুর মৃদুগম্ভীর শব্দ শুনিতে শুনিতে সুখে নৌযাত্রা করিতেছিলাম। এক্ষণে সহসা আমরা ঘোর ব্যাত্যায় পড়িয়া, তরঙ্গাভিঘাতে পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত নিক্ষিপ্ত হইব। কেন না, এখন আমরা বিশেষ প্রকারে মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরের কবির হাতে পড়িলাম। তাঁহার হস্তে কৃষ্ণচরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। যাহা উদার ছিল, তাহা এক্ষণে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে; যাহা সরল, তাহা এক্ষণে কৌশলময়। যাহা সত্যময় ছিল, তাহা এক্ষণে অসত্য ও প্রবঞ্চনার আকর; যাহা ন্যায় ও ধর্মের অনুমোদিত ছিল, তাহা এক্ষণে অন্যায় ও অধর্মে কলুষিত। দ্বিতীয় স্তরের কবির হাতে কৃষ্ণচরিত্র এইরূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু কেন ইহা হইল? দ্বিতীয়স স্তরের কবি নিতান্ত ক্ষুদ্র কবি নহেন; তাঁহার সৃষ্টিকৌশল জাজ্বল্যমান। তিনি ধর্মাধর্মজ্ঞানশূন্য নহেন। তবে তিনি কৃষ্ণের এরূপ দশা ঘটাইয়াছেন কেন? তাহার অতি নিগূঢ় তাৎপর্য দেখা যায়।

প্রথমতঃ আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি ও দেখিব যে, কৃষ্ণ প্রথম স্তরের কবির হাতে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিস্ফুট নহেন। তিনি নিজে ত সে কথা মুখেও আনেন না; পুনঃ পুনঃ আপনার মানবী প্রকৃতিই প্রবাদিত ও পরিচিত করেন; এবং মানুষী শক্তি অবলম্বন করিয়া কার্য করেন। কবিও প্রায় সেই ভাবেই তাঁহাকে স্থাপিত করিয়াছেন। প্রথম স্তরে এমন সন্দেহও হয় যে, যখন ইহা প্রণীত হইয়াছিল, তখন হয়ত ঈশ্বরাবতার বলিয়া সর্বজনস্বীকৃত নহেন। তাঁহার নিজের মনেও সে ভাব সকল সময়ে বিরাজমান নহে। স্থূল কথা, মহাভারতের প্রথম স্তর কতকগুলি প্রাচীন কিম্বদন্তীর সংগ্রহ মাত্র এবং কাব্যালঙ্কার কবিকর্তৃক রঞ্জিত; এক আখ্যায়িকার সূত্রে যথাযথ সন্নিবেশপ্রাপ্ত। কিন্তু যখন দ্বিতীয় স্তর মহাভারতে প্রবিষ্ট হইল, তখন বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সর্বত্র স্বীকৃত। অতএব দ্বিতীয়

স্তরের কবি তাঁহাকে ঈশ্বরাবতারস্বরূপই স্থিত ও নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় কৃষ্ণও অনেক বার আপনার ঈশ্বরত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন, এবং ঐশী শক্তি দ্বারা কার্য নির্বাহ করেন। কিন্তু ঈশ্বর পুণ্যময়, কবি তাহাও জানেন। তবে একটা তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য তাঁহাকে বড় ব্যস্ত দেখি। ইউরোপীয়েরাও সেই তত্ত্ব লইয়া বড় ব্যস্ত। তাঁহারা বলেন, ভগবান্ দয়াময়, করুণাক্রমেই জীবসৃষ্টি করিয়াছেন; জীবের মঙ্গলই তাঁহার কামনা। তবে পৃথিবীতে দুঃখ কেন? তিনি পুণ্যময়, পুণ্যই তাঁহার অভিপ্রেত। তবে আবার পৃথিবীতে পাপ আসিল কোথা হইতে? খ্রীষ্টানের পক্ষে এ তত্ত্বের মীমাংসা বড় কষ্টকর, কিন্তু হিন্দুর পক্ষে তাহা সহজ। হিন্দুর মতে ঈশ্বরই জগৎ। তিনি নিজে সুখদুঃখ, পাপপুণ্যের অতীত। আমরা যাহাকে সুখদুঃখ বলি, তাহা তাঁহার কাছে সুখদুঃখ নহে, আমরা যাহাকে পাপপুণ্য বলি, তাহা তাঁহার কাছে পাপপুণ্য নহে। তিনি লীলার জন্য এই জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে—তাঁহার অংশ। তিনি আপনার সত্তাকে অবিদ্যায় আবৃত করাতেই উহা সুখদুঃখ পাপপুণ্যের আধার হইয়াছে। অতএব সুখদুঃখ পাপপুণ্য তাঁহারই মায়াজনিত। তাঁহা হইতেই সুখদুঃখ ও পাপপুণ্য। দুঃখ যে পাই, তাঁহার মায়া; পাপ যে করি, তাঁহার মায়া। বিষ্ণুপুরাণে কবি কৃষ্ণপীড়িত কালিয় সর্পের মুখে এই কথা দিয়াছেন,—

যথাহং ভবতা সৃষ্টো জাত্যা রূপেণ চেশ্বর।
স্বভাবেন চ সংযুক্তস্তথেদং চেষ্টিতং মম ‖

অর্থাৎ "তুমি আমাকে সর্পজাতীয় করিয়াছ, তাই আমি হিংসা করি।" প্রহ্লাদ বিষ্ণুর স্তব করিবার সময় বলিতেছেন,

বিদ্যাবিদ্যে ভবান্ সত্যমসত্যং ত্বং বিষামৃতে।*

"তুমি বিদ্যা, তুমিই অবিদ্যা, তুমি সত্য, তুমিই অসত্য, তুমি বিষ, তুমিই অমৃত।" তিনি ভিন্ন জগতে কিছুই নাই। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, সত্য, অসত্য, ন্যায়, অন্যায়, বুদ্ধি, দুর্বুদ্ধি সব তাঁহা হইতে।

তিনি গীতায় স্বয়ং বলিতেছেন,

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।

মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ‖ ৭। ১২

“যাহা সাত্ত্বিক ভাব বা রাজস বা তামস, সকলই আমা হইতে জানিবে। আমি তাহার বশ নহি, সে সকল আমার অধীন।” শান্তিপর্বে ভীষ্ম যেখানে কৃষ্ণকে “সত্যাত্মনে নমঃ” “ধর্মাত্মনে নমঃ” বলিয়া স্তব করিতেছেন, সেইখানেই “কামাত্মনে নমঃ” “ঘোরাত্মনে নমঃ,” “ক্রৌর্যাত্মনে নমঃ,” “দৃপ্তাত্মনে নমঃ,” ইত্যাদি শব্দে নমস্কার করিতেছেন; এবং উপসংহারে বলিতেছেন, “সর্বাত্মনে নমঃ।” প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র হইতে এরূপ বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বহু শত পৃষ্ঠা পূরণ করা যাইতে পারে।

যদি তাই, তবে মানুষকে একটা গুরুতর কথা বুঝাইতে পারি। দুঃখ জগদীশ্বরপ্রেরিত, তিনি ভিন্ন ইহার অন্য কারণ নাই। যে পাপিষ্ঠ এজন্য নিন্দিত এবং দণ্ডনীয়, তাহার সম্বন্ধে লোককে বুঝাইতে পারি, ইহার পাপবুদ্ধি জগদীশ্বরপ্রবর্তিত, ইহার বিচারে তিনি কর্তা, তোমরা কে?

এই তত্ত্বের অবতারণায় দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি, ভিতরে ভিতরে প্রবৃত্ত। শ্রেষ্ঠ কবিগণ, কখনই আধুনিক লেখকদিগের মত ভূমিকা করিয়া, ভূমিকায় সকল কথা বলিয়া দিয়া, কাব্যের অবতারণা করেন না। যত্নপূর্বক তাঁহাদিগের মর্মার্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতে হয়। সেক্ষপীয়রের এক একখানি নাটকের মর্মার্থ গ্রহণ করিবার জন্য কত সহস্র কৃতবিদ্য প্রতিভাশালী ব্যক্তি কত ভাবিলেন, কত লিখিলেন, আমরা তাহা বুঝিবার জন্য কত মাথা ঘামাইলাম; কিন্তু আমাদের এই অপূর্ব মহাভারত গ্রন্থের একটা অধ্যায়ের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিবার জন্য আমরা কখনও এক দণ্ডের জন্য কোন চেষ্টা করিলাম না। যেমন হরিকীর্তনকালে এক দিকে বৈষ্ণবেরা খোলে ঘা পড়িতেই কাঁদিয়া পড়িয়া গড়াগড়ি দেন, আর এক দিকে নব্য শিক্ষিতেরা “Nuisance!” বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হয়েন, তেমনই প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থের নাম মাত্রে এক দল মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দেন—মকল কাবল ভুসি শুনিয়া ভক্তিরসে দেশ আপ্লুত করেন, আর এক দল সকলই মিথ্যা, উপধর্ম, অশ্রাব্য, পরিহার্য, উপহাসাস্পদ বিবেচনা করেন। বুঝিবার চেষ্টা কাহারও নাই। শব্দার্থবোধ হইলেই তাঁহারা যথেষ্ট বুঝিলেন মনে করেন। দুঃখের উপর দুঃখ এই, কেহ বুঝাইলেও বুঝিতে ইচ্ছা করেন না।

ঈশ্বরই সব– ঈশ্বর হইতেই সমস্ত। তাঁহা হইতে জ্ঞান, তাঁহা হইতে জ্ঞানের অভাব বা ভ্রান্তি, তাঁহা হইতে বুদ্ধি, তাঁহা হইতে দুর্বুদ্ধি। তাঁহা হইতে সত্য, আবার তাঁহা হইতে অসত্য। তাঁহা হইতে ন্যায়, এবং তাঁহা হইতেই অন্যায়। মনুষ্যজীবনের প্রধান উপাদান এই জ্ঞান ও বুদ্ধি, সত্য ও ন্যায় এবং তদভাবে ভ্রান্ত, দুর্বুদ্ধি অসত্য বা অন্যায় সবই ঈশ্বরপ্রেরিত। কিন্তু জ্ঞান, বুদ্ধি, সত্য, এবং ন্যায় তাঁহা হইতে, ইহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই; হিন্দুর কাছে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তবে ভ্রান্তি, দুর্বুদ্ধি প্রভৃতিও যে তাঁহা হইতে, তাহা মনুষ্যের হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়োজন আছে। অন্ততঃ মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরের কবি, এমন বিবেচনা করেন। আধুনিক জ্যোতির্বিদরা বলিয়া থাকেন, আমরা চন্দ্রের এক পিঠই চিরকাল দেখি, অপর পৃষ্ঠ কখন দেখিতে পাই না। এই কবি সেই অদৃষ্টপূর্ব জগৎরহস্যের অপর পৃষ্ঠ আমাদিগকে দেখাইতে চাহেন। তিনি জয়দ্রথবধে দেখাইতেছেন, ভ্রান্তি ঈশ্বরপ্রেরিত ঘটোৎকচবধে দেখাইবেন, দুর্বুদ্ধিও তাঁহার প্রেরিত, দ্রোণবধে দেখাইবেন, অসত্যও ঈশ্বর হইতে, দুর্যোধন বধে দেখাইবেন, অন্যায়ও তাঁহা হইতে। আরও একটা কথা বাকি আছে। জ্ঞানবল, বুদ্ধিবল, সত্যবল, ন্যায়বল, বাহুবলের কাছে কেহ নয়। বিশেষতঃ রাজনীতিতে বাহুবলের প্রাধান্য। মহাভারত বিশিষ্ট প্রকারে রাজনৈতিক কাব্য অর্থাৎ ঐতিহাসিক কাব্য; ইতিহাসের উপর নির্মিত কাব্য। অতএব এ কাব্যে বাহুবলের স্থান, জ্ঞান বুদ্ধ্যাদির উপরে। দ্বিতীয় স্তরের কবি দেখিতে পান যে, কেবল জ্ঞান ভ্রান্তি, বুদ্ধি দুর্বুদ্ধি, সত্যাসত্য, এবং ন্যায়ান্যায় ঐশিক নিয়োগাধীন, ইহা বলিলেই রাজনৈতিক তত্ত্বটা সম্পূর্ণ হইল না, বাহুবল ও বাহুবলের অভাবও তাই। তিনি ইহা স্পষ্টীকৃত কবিরার জন্য মৌসলপর্ব প্রণীত করিয়াছেন। তথায় কৃষ্ণের অভাবে স্বয়ং অর্জুন লগুড়ধারী কৃষকগণের নিকট পরাভূত হইলেন।

আমি যাহাকে ঐশিক নিয়োগ বলিতেছি, অথবা দ্বিতীয় স্তরের কবি যাহা ঈশ্বরপ্রেরণা বলিয়া বুঝেন, ইউরোপীয়েরা তাহার স্থানে "Law" সংস্থাপিত করিয়াছেন। এই মহাভারতীয় কবিগণের বুদ্ধিতে "Law" কোন স্থান পাইয়াছিল কি না, আমি বলিতে পারি না। তবে ইহা বলিতে পারি, যাহা "লর" উপরে, যাহা হইতে "Law" তাহা তাঁহারা

ভালরূপে বুঝাইয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, সকলই ঈশ্বরেচ্ছা। কৃষ্ণকে কর্মক্ষেত্রে অবতারিত করিয়া, এই কবি সেই ঈশ্বরেচ্ছা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন।

----

* বিষ্ণুপুরাণ। ১ অংশ, ১৯ অধ্যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—ঘটোৎকচবধ

জয়দ্রথবধে আর একটা কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনৈসর্গিক কথা আছে। অর্জুন জয়দ্রথের শিরচ্ছেদে উদ্যত হইলে, কৃষ্ণ বলিলেন, একটা উপদেশ দিই শুন। ইহার পিতা, পুত্রের জন্য তপস্যা করিয়া এই বর পাইয়াছে যে, যে জয়দ্রথের মাথা মাটিতে ফেলিবে, তাহারও মস্তক বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হইবে। অতএব তুমি উহার মাথা মাটিতে ফেলিও না। উহার মস্তক বাণে বাণে সঞ্চালিত করিয়া, যেখানে উহার পিতা সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছে, সেইখানে লইয়া গিয়া তাহার ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত কর। অর্জুন তাহাই করিলেন। বুড়া সন্ধ্যা করিয়া উঠিবার সময় ছিন্ন মস্তক তাঁহার কোল হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। অমনি বুড়ার মাথা ফাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইল।

অনৈসর্গিক বলিয়া কথাটা আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি। তৎপরে ঘটোৎকচবধঘটিত বীভৎস কাণ্ড বর্ণিত করিতে আমি বাধ্য।

হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস ছিল, হিড়িম্বা নামে রাক্ষসী তাহার ভগিনী। ভীম কদাচিৎ রাক্ষসটাকে মারিয়া, রাক্ষসীটাকে বিবাহ করিলেন। বরকন্যা যে পরস্পরের অনুপযোগী, এমন কথা বলা যায় না। তার পর সেই রাক্ষসীর গর্ভে ভীমের এক পুত্র জন্মিল। তাহার নাম ঘটোৎকচ। সেটাও রাক্ষস। সে বড় বলবান্। এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পিতৃপিতৃব্যের সাহায্যার্থে দল বল লইয়া আসিয়া যুদ্ধ করিতেছিল। আমি তাহার কিছু বুদ্ধিবিপর্য্যয় দেখিতে পাই–সে প্রতিযোদ্ধৃগণকে ভোজন না করিয়া, তাহাদিগের সঙ্গে বাণাদির দ্বারা মানুষযুদ্ধ করিতেছিল। তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ দুর্যোধনের সেনার মধ্যে একটা রাক্ষসও ছিল। দুইটা রাক্ষসে খুব যুদ্ধ করে।

এখন, এই দিন, একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হইল। অন্য দিন কেবল দিনেই যুদ্ধ হয়, আজ রাত্রেও আলো জ্বালিয়া যুদ্ধ। রাত্রিতে নিশাচরের বল বাড়ে; অতএব ঘটোৎকচ দুর্নিবার্য হইল। কৌরববীর কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিল না। কৌরবদিগের রাক্ষসটাও মারা গেল। কেবল কর্ণই একাকী ঘটোৎকচের সমকক্ষ হইয়া, রাক্ষসের সঙ্গে

যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শেষ কর্ণও আর সামলাতেই পারেন না। তাঁহার নিকট ইন্দ্রদত্তা একপুরুষঘাতিনী এক শক্তি ছিল। এই শক্তি সম্বন্ধে অদ্ভুতের অপেক্ষাও অদ্ভুত এক গল্প আছে—পাঠককে তৎপঠনে পীড়িত করিতে আমি অনিচ্ছুক। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই শক্তি কেহ কোন মতেই ব্যর্থ করিতে পারে না, এক জনের প্রতি প্রযুক্ত হইলে সে মরিবে, কিন্তু শক্তি আর ফিরিবে না; তাই একপুরুষঘাতিনী। কর্ণ এই অমোঘ শক্তি অর্জুনবধার্থ তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আজ ঘটোৎকচের যুদ্ধে বিপন্ন হইয়া তাহারই প্রতি শক্তি প্রযুক্ত করিলেন। ঘটোৎকচ মরিল। মৃত্যুকালে বিন্ধ্যাচলের একপাদপরিমিত শরীর ধারণ করিল, এবং তাহার চাপে এক অক্ষৌহিণী সেনা মরিল!

এ সকল অপরাধে প্রাচীন হিন্দু কবিকে মার্জনা করা যায়, কেন না, বালক ও অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের পক্ষে এ রকম গল্প বড় মনোহর। কিন্তু তিনি তার পর যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় কেবল তাঁহার নিজেই মনোহর। তিনি বলেন, ঘটোৎকচ মরিলে পাণ্ডবেরা শোককাতর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ রথের উপর নাচিতে আরম্ভ করিলেন! তিনি আর গোপবালক নহেন, পৌত্র হইয়াছে; এবং হঠাৎ বায়ুরোগাক্রান্ত হওয়ার কথাও গ্রন্থকার বলেন না। কিন্তু তবু রথের উপর নাচ! কেবল নাচ নহে, সিংহনাদ ও বাহুর আস্ফোটন। অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? এত নাচকাচ কেন? কৃষ্ণ বলিলেন, "কর্ণের নিকট যে অমোঘ শক্তি ছিল, যা তোমার বধের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ঘটোৎকচের জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার আর ভয় নাই; তুমি এক্ষণে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবে।" জয়দ্রথবধ উপলক্ষে দেখিয়াছি, কর্ণের সঙ্গে অর্জুনের পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ হইয়াছে, এবং কর্ণ পরাভূত হইয়াছেন। তখন সেই ঐন্দ্রী শক্তির কোন কথাই কাহারও মনে হয় নাই; কবিরও নহে। কিন্তু তখন মনে করিলে জয়দ্রথবধ হয় না; কর্ণ জয়দ্রথের রক্ষক। সুতরাং তখন চুপে চাপে গেল। যাক—এই শক্তিঘটিত বৃত্তান্তটা অনৈসর্গিক, সুতরাং তাহা আমাদের আলোচনার অযোগ্য। যে কথাটা বলিবার জন্য, ঘটোৎকচবধের কথা তুলালাম, তাহা এই। কৃষ্ণ, অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিতেছেন,

"যাহা হউক, হে ধনঞ্জয়! আমি তোমার হিতার্থ বিধি উদ্ভাবনপূর্বক ক্রমে ক্রমে মহাবলপরাক্রান্ত জরাসন্ধ, শিশুপাল, নিষাদ একলব্য, হিড়িম্ব, কির্মীর, বক, আলায়ুধ, উগ্রকর্মা, ঘটোৎকচ প্রভৃতি রাক্ষসের বধ সাধন করিয়াছি।"

কথাটা সত্য নহে। কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে অর্জুনের হিতার্থ নহে, শিশুপাল তাঁহাকে সভামধ্যে অপমানিত ও যুদ্ধ আহূত করিয়াছিল, এই জন্য বা যজ্ঞের রক্ষার্থ। জরাসন্ধবধেরও কৃষ্ণ কর্তা না হউন, প্রবর্তক কিন্তু সে অর্জুনহিতার্থ নহে, কারারুদ্ধ রাজগণের মুক্তিজন্য। কিন্তু বক, হিড়িম্ব, কির্মীর প্রভৃতি রাক্ষসদিগের বধের, এবং একলব্যের অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদের সঙ্গে কৃষ্ণের কিছুমাত্র সম্বন্ধ ছিল না। তিনি তাহার কিছুই জানিতেন না, এবং ঘটনাকালে উপস্থিতও ছিলেন না। মহাভারতে এক স্থানে পাই বটে, কৃষ্ণ একলব্যকে বধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদের কথা তাহার বিরোধী। ঘটনাগুলি, অর্থাৎ একলব্যের অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদ এবং রাক্ষসগণের বধ, প্রকৃত ঘটনাও নহে।

তবে, এ মিথ্যা বাক্য কৃষ্ণমুখে সাজাইবার উদ্দেশ্য কি?

এ সম্বন্ধে কেবল আর একটা কথা বলিব। ভক্তে বলিতে পারিবেন, কৃষ্ণ ইচ্ছার দ্বারা সকলই করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছাতেই হিড়িম্বাদি বধ, এবং ঘটোৎকচের প্রতি কর্ণের শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল। এ কথা সঙ্গত নহে। কৃষ্ণই বলিতেছেন যে, তিনি বিবিধ "উপায় উদ্ভাবন" করিয়া ইহা করিয়াছেন। আর যদি ইচ্ছাময় সর্বকর্তা ইচ্ছাদ্বারা এ সকল কার্য সাধন করিবেন, তবে মনুষ্যশরীর লইয়া অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন কি ছিল? আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি যে, কৃষ্ণ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা কোন কর্ম করেন না; পুরুষকার অবলম্বন করেন। তিনি নিজেও তাহা বলিয়াছেন; সে কথা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। দেখা গিয়াছে যে, তিনি ইচ্ছা করিয়াও যত্ন করিয়া সন্ধিসংস্থাপন করিতে পারেন নাই বা কর্ণকে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে আনিতে পারেন নাই। আর যদি ইচ্ছার দ্বারা কর্ম সম্পন্ন করিবেন, তবে ছাই ভস্ম জড়পদার্থ একটা শক্তি-অস্ত্রের জন্য ইচ্ছাময়ের এত ভাবনা কেন?

ইহার ভিতরে আসল কথাটা, যাহা পূর্বপরিচ্ছেদে বলিয়াছি। বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরিত, দুর্বুদ্ধিও ঈশ্বরপ্রেরিত, কবি এই কথা বলিতে চাহেন। কর্ণ অর্জুনের জন্য ঐন্দ্রী শক্তি তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন যে ঘটোৎকচের উপর তাহা পরিত্যাগ করিলেন, ইহা কর্ণের

দুর্বুদ্ধি। কৃষ্ণ বলিতেছেন, সে আমি করাইয়াছি ; অর্থাৎ দুর্বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরিত। শিশুপাল দুর্বুদ্ধিক্রমে সভাতলে কৃষ্ণের অসহ্য অপমান করিয়াছিলেন। জরাসন্ধ, সৈন্যসাহায্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অজেয়; পাণ্ডবের কথা দূরে থাক্; কৃষ্ণসনাথ যাদবেরাও তাঁহাকে জয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু শারীরিক বলে ভীম তাঁহার অপেক্ষা বলবান্; একাকী ভীমের সঙ্গে মল্লের মত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তাদৃশ রাজরাজেশ্বর সম্রাটের পক্ষে দুর্বুদ্ধি। কৃষ্ণোক্তির মর্ম এই যে, সে দুর্বুদ্ধিও আমার প্রেরিত। দ্রোণাচার্য অনার্য একলব্যের নিকট গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তাহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ চাহিয়াছিলেন। ঐ অঙ্গুষ্ঠ গেলে বহুকষ্টলব্ধ একলব্যের ধনুর্বিদ্যা নিষ্ফল হয়। কিন্তু একলব্য সে প্রার্থিত গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন। ইহা একলব্যের দারুণ দুর্বুদ্ধি। কৃষ্ণের কথার মর্ম এই যে, সে দুর্বুদ্ধি তাঁহার প্রেরিত—ঈশ্বরপ্রেরিত। রাক্ষসবধ সম্বন্ধেও ঐরূপ। এ সমস্তই দ্বিতীয় স্তর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—দ্রোণবধ

প্রাচীন ভারতবর্ষে কেবল ক্ষত্রিয়েরাই যুদ্ধ করিতেন, এমত নহে। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য যোদ্ধার কথা মহাভারতেই আছে। দুর্যোধনের সেনানায়কদিগের মধ্যে তিন জন প্রধান বীর ব্রাহ্মণ;– দ্রোণ, তাঁহার শ্যালক কৃপ, এবং তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামা। অন্যান্য বিদ্যার ন্যায়, ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধবিদ্যারও আচার্য ছিলেন। দ্রোণ ও কৃপ, এইরূপ যুদ্ধাচার্য। এই জন্য ইঁহাদিগকে দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্য বলিত।

এদিকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে বিপদ্‌ও বেশী। কেন না, রণেও ব্রাহ্মণকে বধ করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাতক ঘটে। অন্ততঃ মহাভারতকার এই কারণ, ব্রাহ্মণ যোদ্ধৃগণকে লইয়া বড় বিপন্ন, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। এই জন্য কৃপ অশ্বত্থামা যুদ্ধে মরিল না। কৌরবপক্ষীয় সকলেই মরিল, কেবল তাঁহারা দুই জনে মরিলেন না; তাঁহারা অমর বলিয়া গ্রন্থকার নিষ্কৃতি পাইলেন। কিন্তু দ্রোণাচার্যকে না মারিলে চলে না; ভীষ্মের পর তিনি সর্বপ্রধান যোদ্ধা; তিনি জীবিত থাকিতে পাণ্ডবেরা বিজয়লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু এ কথাও গ্রন্থকার বলিতে অনিচ্ছুক যে, ধার্মিক রাজগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে মারিয়া ব্রহ্মহত্যার ভাগী হইল। বিশেষতঃ দ্রোণাচার্যকে দ্বৈরথযুদ্ধে পরাজিত করিতে পারে, পাণ্ডবপক্ষে এমন বীর অর্জুন ভিন্ন আর কেহই নাই; কিন্তু দ্রোণাচার্য অর্জুনের গুরু, এজন্য অর্জুনের পক্ষে বিশেষরূপে অবধ্য। তাই গ্রন্থকার একটা কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

পাণ্ডবভার্যা দ্রৌপদীর পিতা দ্রুপদ রাজার সঙ্গে পূর্বকালে বড় বিবাদ হইয়াছিল। দ্রুপদ, দ্রোণের বিক্রমের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই–অপদস্থ ও অপমানিত হইয়াছিলেন। এজন্য তিনি দ্রোণবধার্থ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞকুণ্ড হইতে দ্রোণবধকারী পুত্র উদ্ভূত হয়–নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন। ধৃষ্টদ্যুম্ন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের সেনাপতি। তিনিই দ্রোণবধ করিবেন, পাণ্ডবদিগের এই ভরসা। যিনি ব্রহ্মবধার্থ দৈবকর্মজাত, ব্রহ্মবধ তাঁহার পক্ষে পাপ নয়।

কিন্তু মহাভারত এক হাতের নয়, নানা রচয়িতা নানা দিকে ঘটনাবলী যথেচ্ছা লইয়া গিয়াছেন। পনের দিবস যুদ্ধ হইল, ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যের কিছুই করিতে পারিলেন না। তাঁহার নিকট পরাভূত হইলেন। অতএব দ্রোণ মরার ভরসা নাই–প্রত্যহ পাণ্ডবদিগের সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল। তখন দ্রোণবধার্থ একটা ঘোরতর পাপাচারের পরামর্শ পাণ্ডব পক্ষে স্থির হইল। এই মহাপাপমন্ত্রণার কলঙ্কটা কৃষ্ণের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে। তিনিই ইহার প্রবর্তক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন,

"হে পাণ্ডবগণ! অন্যের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রকে দ্রোণাচার্যকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু উনি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিলে মনুষ্যেরাও তাঁহার বিনাশ করিতে পারে, অতএব তোমরা ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক উঁহারে পরাজয় করিবার চেষ্টা কর।"

আর পাতা দশ বার পূর্বে যাঁহার মুখে কবি এই বাক্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন,

"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যে স্থানে ব্রহ্ম, সত্য, দম, শৌচ, ধর্ম, শ্রী, লজ্জা, ক্ষমা, ধৈর্য অবস্থান করে, আমি সেইখানেই অবস্থান করি।"*

যিনি ভগবদ্গীতা-পর্বাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, ধর্মসংরক্ষণের জন্যই যুগে যুগে অবতীর্ণ হই; যাঁহার চরিত্র, এ পর্যন্ত আদর্শ ধার্মিকের চরিত্র বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে, যাঁহার ধর্মে দার্ঢ্য শত্রুগণ কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে,# তিনি কি না ডাকিয়া বলিতেছেন, "তোমরা ধর্ম পরিত্যাগ কর! তাই বলিতেছিলাম, মহাভারত নানা হাতের রচনা; যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ গড়িয়াছেন।

কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন,

"আমার নিকট নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে, অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলে দ্রোণ আর যুদ্ধ করিবেন না। অতএব কোন ব্যক্তি উঁহার নিকট গমনপূর্বক বলুন যে অশ্বত্থামা সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছেন।"

অর্জুন মিথ্যা বলিতে অস্বীকৃত হইলেন, যুধিষ্ঠির কষ্টে তাহাতে সম্মত হইলেন। ভীম বিনা বাক্যব্যয়ে অশ্বত্থামা নামক একটা হস্তীকে মারিয়া আসিয়া দ্রোণাচার্যকে বলিলেন, অশ্বত্থামা মারিয়াছেন।?"! দ্রোণ জানিতেন, তাঁহার পুত্র "অমিতবলবিক্রমশালী, এবং

শত্রুর অসহ্য”—অতএব ভীমের কথা বিশ্বাস করিলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত করিবার চেষ্টায় মনোযোগী হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুনশ্চ আবার যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অশ্বত্থামার মৃত্যুর কথা সত্য কি না? যুধিষ্ঠির কখনও অধর্ম করেন না, এবং অসত্য বলেন না, এজন্য তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, অশ্বত্থামা কুঞ্জর মরিয়াছে—কিন্তু কুঞ্জর শব্দটা অব্যক্ত রহিল।!!

তাহাতেই বা কি হইল? দ্রোণ প্রথমে বিমনায়মান হইলেন বটে, কিন্তু তৎপরে অতি ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুস্বরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার আপনার সাধ্যের অতীত যুদ্ধ করিয়া, নিরস্ত্র ও বিরথ হইয়া দ্রোণহস্তে মরণাপন্ন হইলেন। তখন ভীম গিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিলেন, এবং দ্রোণাচার্যের রথ ধারণ করিয়া কতকগুলি কথা বলিলেন, তাহাই দ্রোণকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। ভীম বলিলেন,

“হে ব্রাহ্মণ! যদি স্বধর্মে অসন্তুষ্ট শিক্ষিতাস্ত্র অধম ব্রাহ্মণগণ সমরে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণের কখনই ক্ষয় হয় না। পণ্ডিতেরা প্রাণিগণের হিংসা না করাই প্রধান ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করেন। সেই ধর্ম প্রতিপালন করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য; আপনিই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; কিন্তু চণ্ডালের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ হইয়া পুত্র ও কলত্রের উপকারার্থ অর্থলালসা নিবন্ধন বিবিধ ম্লেচ্ছজাতি ও অন্যান্য প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশ করিতেছেন। আপনি এক পুত্রের উপকারার্থ স্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক স্বকার্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অসংখ্য জীবের জীবন নাশ করিয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছেন না?”

কথাগুলি সকলই সত্য। ইহার পর আর তিরস্কার কি আছে? ইহাতেও দুর্যোধনের ন্যায় দুরাত্মার মত ফিরিতে পারে না বটে, কিন্তু দ্রোণাচার্য ধর্মাত্মা; ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। ইহার পর অশ্বত্থামার মৃত্যুর কথাটা আর না তুলিলেও চলিত। কিন্তু তাহাও এখানে আবার পুনরুক্ত হইয়াছে।

এ কথার পর দ্রোণাচার্য অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার মাথা কাটিয়া আনিলেন।

এক্ষণে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। যে কার্যটা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যদি যথার্থ ঘটিয়া থাকে, তবে যিনি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, তিনি মহাপাপে লিপ্ত। গ্রন্থকারও তাহা

বুঝেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের রথ ইতিপূর্বে পৃথিবীর উপর চারি অঙ্গুলি ঊর্ধ্বে চলিত, এখন ভূমি স্পর্শ করিয়া চলিল। এই অপরাধে তাঁহার নরক দর্শন হইয়াছিল, ইহাও বলিয়াছেন। আমাদের মতে, এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা এবং মিথ্যা প্রবঞ্চনার দ্বারা গুরুহত্যার উপযুক্ত দণ্ড, নরকদর্শন মাত্র নহে;—অনন্ত নরকই ইহার উপযুক্ত।

কৃষ্ণ এই মহাপাপের প্রবর্তক। এজন্য কৃষ্ণকে সেইরূপ অপরাধী ধরিতে হয়। কিন্তু ইহার উত্তর এই প্রচলিত আছে যে, যিনি ঈশ্বর, স্বয়ং পাপ পুণ্যের কর্তা ও বিধাতা, পাপপুণ্যই যাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার আবার পাপপুণ্য কি? পাপপুণ্য তাঁহাকে স্পর্শিতে পারে না। এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি মনুষ্যদেহ-ধারণকালে পাপ তাঁহার আচরণীয়? তিনি নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি ধর্মসংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ—পাপাচরণ দ্বারা কি ধর্মসংস্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্য? তিনি স্বয়ং ত এরূপ বলেন না। তিনি গীতায় বলিয়াছেন,

"জনকাদি কর্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। জনগণকে স্বধর্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য (দৃষ্টান্তের দ্বারা) তুমি কর্ম কর। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ করিয়া থাকেন, ইতর লোকেও তাই করে; শ্রেষ্ঠ যাহা মানেন, লোক তাহারই অনুবর্তিত হয়। হে পার্থ! ত্রিলোকে আমার কর্তব্য কিছুই নাই; আমার প্রাপ্তব্য বা অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই; তথাপি আমি কর্ম করি। (কেন না) আমি যদি কদাচিৎ অতন্দ্রিত হইয়া কর্মানুবর্তন না করি, তবে মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথের অনুবর্তী হইবে।"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩য় অঃ, ২০-২৩।

অতএব শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন, মানবাবতারে, স্বকার্যের দৃষ্টান্তের দ্বারা ধর্মসংস্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্যের মধ্যে। অতএব স্বকর্মে মহাপাপের দৃষ্টান্ত তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না।

তবে এ কাণ্ডটা কি? তাহার মীমাংসা স্থির না করিয়া আমি কৃষ্ণচরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই নাই। কেন না, বৃন্দাবনের গোপী ও "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" ইহাই কৃষ্ণের প্রধান অপবাদ।

কাণ্ডটা কি? তাহার উত্তর, কাণ্ডটা সমস্তই অমৌলিক। যদি পাঠক মনোযোগপূর্বক আমার এই গ্রন্থখানি পড়িয়া থাকেন, তবে বুঝিয়া থাকিবেন যে, সমস্ত মহাভারত, অর্থাৎ এক্ষণে যে গ্রন্থ মহাভারত নামে প্রচলিত, তাহা এক হাতের নহে। তাহার কিয়দংশ

মৌলিক, আদিম মহাভারত বা “প্রথম স্তর”। অপরাংশ অমৌলিক ও পরবর্তী কবিগণকর্তৃক মূলগ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত। কোন্ অংশ মৌলিক, আর কোন্ অংশ অমৌলিক ইহা নিরূপণ করা কঠিন। নিরূপণ জন্য আমি কয়েকটি সঙ্কেত পাঠককে বলিয়া দিয়াছি। সেইগুলি এখন পাঠককে স্মরণ করিতে হইবে।

(১) তাহার মধ্যে একটি এই,–

“শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্রগুলির সর্বাংশ সুসঙ্গত হয়। যদি কোথাও ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে।”

উদাহরণ দিবার জন্য বলিয়াছিলাম যে, যদি কোথাও ভীষ্মের পরদারপরায়ণতা বা ভীমের ভীরুতা দেখি, তবে জানিব, ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত। এখানে ঠিক তাই; এক মাত্রায় নহে, তিন মাত্রায় কেবল তাই। পরম ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে এই নৃশংস বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যা প্রবঞ্চনার দ্বারা গুরুনিপাত যাদৃশ অসঙ্গত, তত অসঙ্গত আর কোন দুই বস্তুই হইতে পারে না। তার পর মহাতেজস্বী, বলগর্বশালী, ভয়শূন্য ভীমের চরিত্রের সঙ্গেও ইহা তদ্রূপ অসঙ্গত। ভীম বাহুবল ভিন্ন আর কিছু মানেন না–শত্রুর বিরুদ্ধে আর কিছু প্রয়োগ করেন না; রাজ্যার্থেও নহে, প্রাণরক্ষার্থেও নহে। স্থানান্তরেও কথিত আছে, অশ্বত্থমা নারায়ণাস্ত্র নামে অনিবার্য দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন-তাহাতে সমস্ত পৃথিবী নষ্ট হইতে পারে। দিব্যাস্ত্রবিৎ অর্জুনও তাহার নিবারণে অক্ষম; সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল। ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার একটি উপায় ছিল–এই দৈবাস্ত্র সমরবিমুখ ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না। অতএব প্রাণরক্ষার্থ কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে সমস্ত পাণ্ডবসেনা ও সেনাপতিগণ, রথ ও বাহন হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক বিমুখ হইয়া বসিলেন; কৃষ্ণের আজ্ঞায় অর্জুনকেও তাহা করিতে হইল। কেবল, ভীম কিছুতেই তাহা করিলেন না,–বলিলেন, “আমি শরনিকর নিপাতে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ করিতেছি। আমি এই সুবর্ণময়ী গুর্বী গদা সমুদ্যত করিয়া দ্রোণপুত্রের নারায়ণাস্ত্র বিমর্দিত করতঃ অন্তকের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিব। এই ভূমণ্ডলমধ্যে যেমন কোন জ্যোতিঃপদার্থই সূর্যের সদৃশ নহে, তদ্রূপ আমার তুল্য পরাক্রমশালী আর কোন মনুষ্যই নাই। আমার এই যে ঐরাবতশুণ্ডসদৃশ সুদৃঢ় ভুজদণ্ড অবলোকন করিতেছ, ইহা

হিমালয় পর্বতেরও নিপাতনে সমর্থ। আমি অযুতনাগতুল্য বলশালী; দেবলোকে পুরন্দর যেরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নরলোকে আমিও তদ্রূপ। আজি আমি দ্রোণপুত্রের অস্ত্রনিবারণে প্রবৃত্ত হইতেছি, সকলে আমার বাহুবীর্য অবলোকন করুন। যদি কেহ এই নারায়ণাস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং সমস্ত কৌরব ও পাণ্ডবসমক্ষে এই অস্ত্রের প্রতিদন্দ্বী হইব।" স্বীকার করি, বড়াই বড় বেশী, গল্পটাও নিতান্ত আষাঢ়ে। তা হৌক–সত্য বলিয়া কাহাকেও ইহা গ্রহণ করিতে হইতেছে না। কবিপ্রণীত চরিত্রচরিত্রের সুসঙ্গতি লইয়া কথা কহিতেছি। নারায়ণস্ত্রমোক্ষ মৌলিক না হইতে পারে, কিন্তু এই ছাঁচে মৌলিক মহাভারতে সর্বত্রই ভীমের চরিত্র ঢালা। ইহার সঙ্গে ভীমের সেই শৃগালোপম দ্রোণপ্রবঞ্চনা কতটা সুসঙ্গত? এই ভীম কি স্ত্রীলোকেরও ঘৃণাস্পদ যে শত্রুবধোপায়, তাহা অবলম্বন করিতে পারে? দ্রোণাচার্যের অপেক্ষা নারায়ণাস্ত্র সহস্রগুণে ভয়ঙ্কর; সে নারায়ণাস্ত্রের সম্মুখে সিংহের ন্যায় দৃপ্ত, যাহাকে বলপ্রয়োগ ব্যতীত** নারায়ণাস্ত্রের সম্মুখ হইতে কেহ বিমুখ করিতে পারিল না, তাহাকে অর্জুনের প্রতিযোদ্ধা মাত্র দ্রোণের ভয়ে শৃগালধমের ন্যায় কার্যপ্রবৃত্ত বলিয়া যে কবি বর্ণনা করিয়াছেন, সে কবির কবিত্ব কোথায়? মহাভারত প্রণয়ন কি তাঁহার সাধ্য?

তবে নিহত অশ্বত্থামাগজের এই গল্প, ভীমের চরিত্রের সঙ্গে অসঙ্গত; যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গেও অসঙ্গত, ইহা দেখিয়াছি, কিন্তু ভীমের চরিত্রের সঙ্গে ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে ইহার যতটা অসঙ্গতি, তদপেক্ষা কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গেও ইহার অসঙ্গতি আরও বেশী। যদি আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা পাঠক বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই অসঙ্গতির পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন। আলোকে অন্ধকারে যত অসঙ্গতি; কৃষ্ণে শ্বেতে; তাপে শৈত্যে; মধুরে কর্কশে; রোগে স্বাস্থ্যে; ভাবে অভাবে যতটা অসঙ্গতি, ইহাও তত। যখন মৌলিক চরিত্রের সঙ্গে একটি নয়, তিনটি মৌলিক চরিত্রের সঙ্গে এ গল্পের এত অসঙ্গতি, তখন ইহা অমৌলিক ও প্রক্ষিপ্ত, এবং অন্যকবিপ্রণীত বলিয়া আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি।

(২) আমার কথা শেষ হয় নাই। কোন্ অংশ মৌলিক, কোন্ অংশ অমৌলিক, ইহার নির্বাচন জন্য যে কয়েকটি লক্ষণ নির্দিষ্ট করিয়াছি, তাহার একটির দ্বারা পরীক্ষা করায় এই হতগজবৃত্তান্তটা অমৌলিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। আরেকটির দ্বারা পরীক্ষা করিয়া

দেখা যাউক। আর একটি সূত্র এই যে, দুইটি বিবরণ পরস্পরবিরোধী হইলে, তাহার একটি প্রক্ষিপ্ত। এখন মহাভারতে, ঐ অশ্বত্থামাগজের গল্পের সঙ্গে সঙ্গেই দ্রোণবধের আর একটি বৃত্তান্ত পাই। একটিই যথেষ্ট কারণ, কিন্তু দুইটি একত্র জড়ান হইয়াছে। আমরা সেই স্বতন্ত্র বিবরণটি পৃথক্ করিয়া মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা বুঝাইবার জন্য, অগ্রে আমার বলা উচিত যে, দ্রোণ অধর্মযুদ্ধ করিতেছিলেন। মহাভারতে কথিত অন্যান্য দৈবাস্ত্রের মধ্যে ব্রহ্মাস্ত্র একটি। আজি এ দেশের লোকে, যে উপায়ে যে কার্যসাধনে অব্যর্থ, তাহাকে সেই কার্যের "ব্রহ্মাস্ত্র" বলে। এই ব্রহ্মাস্ত্র অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রয়োগ নিষিদ্ধ ও অধর্ম, ইহাই ঋষিদিগের মত। দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা অস্ত্রানভিজ্ঞ সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতেছিলেন। এমন সময়ে,–

"বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, অত্রি, ভৃগু, অঙ্গিরা, সিকত, প্রশ্নি, গর্গ, বালখিল্য, মরীচিপ ও অন্যান্য ক্ষুদ্রতর সাগ্নিক ঋষিগণ আচার্যকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহারে ব্রহ্মলোকে নীত করিবার বাসনায় সকলে শীঘ্র সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে দ্রোণ! তুমি অধর্মযুদ্ধ করিতেছ; অতএব এক্ষণে তোমার বিনাশসময় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আয়ুধ পরিত্যাগ করিয়া একবার আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর। আর তোমার এরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য নহে। তুমি বেদবেদাঙ্গবেত্তা এবং সত্যধর্মপরায়ণ; অতএব এরূপ কার্য করা তোমার নিতান্ত অনুচিত; তুমি অবিমুগ্ধ হইয়া আয়ুধ পরিত্যাগপূর্বক শাশ্বত পথে অবস্থান কর। অদ্য তোমার মর্ত্যলোকনিবাসের কাল পরিপূর্ণ হইয়াছে। হে বিপ্র! অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ব্রহ্মাস্ত্রে বিনাশ করিয়া নিতান্ত অসৎকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব আয়ুধ অবিলম্বে পরিত্যাগ কর; আর ক্রূরকার্যের অনুষ্ঠান করা তোমার কর্তব্য নহে।"

ইহাতেই দ্রোণাচার্য যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের নিকট অশ্বত্থামার মৃত্যু শুনিয়াও যুদ্ধে ক্ষান্ত হন নাই, পূর্বে বলিয়াছি। তার পরেও তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনষ্ট করিবার উপক্রম করিলে, যদুবংশীয় সাত্যকি আসিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা সম্পাদন করিলেন। সাত্যকির সঙ্গে কেহই যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইল না। দ্রোণও নিবারিত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির স্বপক্ষীয় বীরগণকে বলিলেন,–

"হে বীরগণ! তোমরা পরম যত্নসহকারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হও। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের বিনাশের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। অদ্য সমরক্ষেত্রে দ্রুপদনন্দনের কার্য সন্দর্শনে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, উনি ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণকে নিপাতিত করিবেন। অতএব তোমরা মিলিত হইয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধারম্ভ কর।"

এই কথার পর, পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাভারত হইতে পুনশ্চ উদ্ধৃত করিতেছি,–

"মহারথ দ্রোণও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাগত বীরগণের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। সত্যসন্ধ মহাবীর দ্রোণাচার্য মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইলে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত, ও প্রচণ্ড বায়ু সেনাগণকে ভীত করতঃ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহতী উল্কা সূর্য হইতে নিঃসৃত হইয়া আলোক প্রকাশপূর্বক সকলকে শঙ্কিত করিল। দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্র সকল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। রথের ভীষণ নিস্বন ও অশ্বগণের অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তৎকালে মহারথ দ্রোণ নিতান্ত নিস্তেজ হইলেন। তাঁহার বাম নয়ন ও বাম বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি সম্মুখে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত উন্মনা হইলেন, এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের বাক্য স্মরণ করিয়া ধর্মযুদ্ধ অবলম্বনপূর্বক প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন।"

পাঠক দেখিবেন যে, এখানে দ্রোণের প্রাণত্যাগের অভিলাষের কারণপরম্পরার মধ্যে অশ্বত্থামার মৃত্যুসম্বাদ পরিগণিত হয় নাই। বিচারকের পক্ষে এই এক প্রমাণ যথেষ্ট।

দ্রোণ তথাপি যুদ্ধ ছাড়িলেন না। মহাভারতকার দশ হাজার সৈন্যধ্বংসের কম কথা কন না, তিনি বলেন, তার পরেও দ্রোণাচার্য ত্রিশ হাজার সৈন্য বিনষ্ট করিলেন, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুনর্বার পরাভূত করিলেন। এবার ভীম ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিলেন, এবং দ্রোণাচার্য্যের রথ ধরিয়া (ভীমের অভ্যাস, রথগুলা ধরিয়া আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন##) সেই পূর্বোদ্ধৃত তীব্র তিরস্কার করিলেন। সেই তিরস্কারে দ্রোণ যথার্থ আয়ুধ ত্যাগ করিলেন,–

"এবং তৎপরে রথোপরি সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র সন্নিবেশিত করিয়া যোগ অবলম্বনপূর্বক সমস্ত জীবকে অভয়প্রদান করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন রন্ধ্র প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রথে

ভীষণ সশরশরাশন অবস্থানপূর্বক করবাল ধারণপূর্বক দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে দ্রোণাচার্য ধৃষ্টদ্যুম্নের বহির্ভূত হইলে সমরাঙ্গনে মহান্ হাহাকার-শব্দ সমুত্থিত হইল। এদিকে জ্যোতির্ময় মহাতপা দ্রোণাচার্য অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক শমভাব অবলম্বন করিয়া যোগসহকারে অনাদিপুরুষ বিষ্ণুর ধ্যান করিতে লাগিলেন। এবং মুখ ঈষৎ উন্নমিত, বক্ষঃস্থল বিষ্টম্ভিত ও নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া বিষয়াদি বাঞ্ছা পরিত্যাগ ও সাত্ত্বিকভাব অবলম্বনপূর্বক একাক্ষর বেদমন্ত্র ওঁকার ও পরাৎপর দেবদেবেশ বাসুদেবকে স্মরণ করতঃ সাধুজনেরও দুর্লভ স্বর্গলোকে গমন করিলেন।”

তার পর ধৃষ্টদ্যুম্ন আসিয়া মৃতদেহের মস্তক কাটিয়া লইয়া গেলেন।

অতএব, দ্রোণের মৃত্যুর মহাভারতে দুইটি পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। দুইটি সম্পূর্ণরূপে যে পরস্পরের বিরোধী, তাহা নহে; একত্রে গাঁথা যায়। একত্রে গাঁথাও আছে–ভাল জোড় লাগে নাই, মোটারকম রিপুকর্ম, স্থানে স্থানে ফাঁক পড়িয়াছে। ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই দুইটি বিবরণের মধ্যে একটিই দ্রোণের মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট, দুইটির প্রয়োজন নাই। একজন কবির এইরূপ দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ জোড়া দিবার চেষ্টা করিবার সম্ভাবনা ছিল না। দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের দুই জন কবির প্রণীত বলিয়া কাজেই স্বীকার করিতে হয়। কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত? দ্রোণের প্রাণত্যাগেচ্ছার যে সকল কারণ মহাভারত হইতে উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ তাহাতে ধরা হয় নাই। অতএব অশ্বত্থামার মৃত্যুঘটিত বৃত্তান্তটি প্রকৃত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু যে সকল সূত্রে পূর্বে সংস্থাপিত করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলেই ইহার মীমাংসা হইবে।

আমরা বলিয়াছি যে, যখন দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বা পরস্পরবিরোধী বিবরণের মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্থির হইবে, তখন কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত, তাহা মীমাংসার জন্য দেখিতে হইবে, কোন্‌টি অন্য লক্ষণের দ্বারা পরস্পরবিরোধী বলিয়া বোধ হয়। যেটি অন্য লক্ষণেও ধরা পড়িবে, সেইটিই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিব।* আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, অশ্বত্থামাবধসংবাদবৃত্তান্ত, কৃষ্ণ, ভীম ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে অত্যন্ত অসঙ্গত। আমরা পূর্বে এই একটি লক্ষণ স্থির করিয়াছি যে, এরূপ অসঙ্গতি থাকিলে তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরিতে হইবে।# অতএব এই অশ্বত্থামাবধসংবাদ-বৃত্তান্ত প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৩) আরও একটি কথা আছে। দেখিয়াছি যে, অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদে দ্রোণ যুদ্ধে কিছুমাত্র শৈথিল্য করেন নাই। তবে কৃষ্ণ একথা বলাইলেন কেন? দ্রোণের যুদ্ধে নিবৃত্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়া? সম্ভাবনা কোথা? দ্রোণ জানেন, অশ্বত্থামা অমর। সে কথা অনৈসর্গিক বলিয়া না হয় ছাড়িয়া দিলাম। সামান্য মানুষের, তোমার আমার অথবা একটা কুলি মজুরের যে বুদ্ধি, ততটুকু বুদ্ধিও কৃষ্ণের ছিল, যদি এরূপ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, কৃষ্ণের এরূপ পরামর্শ দিবার সম্ভাবনা ছিল না। দ্রোণই হউক আর যেই হউক, এরূপ সংবাদ শুনিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত হইবার আগে, একবার স্বপক্ষীয় কাহাকেও কি জিজ্ঞাসা করিবেন না যে, অশ্বত্থামা মরিয়াছে কি? অশ্বত্থামার অনুসন্ধানে পাঠাইবেন না? তাহাই নিতান্ত সম্ভব। তাহা ঘটিলে জুয়াচুরি তখনই সমস্ত ফাঁসিয়া যাইবে।

অতএব উপন্যাসটি প্রথমতঃ প্রক্ষিপ্ত, দ্বিতীয়তঃ মিথ্যা। আমি এমত বলি না যে, ঋষিবাক্যে দ্রোণের অস্ত্র পরিত্যাগ করাই সত্য। ঋষিদের সেই রণক্ষেত্রে আগমন অনৈসর্গিক ব্যাপার, সুতরাং তাহাও অপ্রকৃত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে আমি বাধ্য। ইহার মধ্যে প্রকৃত বা বিশ্বাসযোগ্য কথা এই হইতে পারে যে, দ্রোণ অধর্মাচরণ করিতেছিলেন–ভীমের তীব্র তিরস্কারে তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। যুদ্ধে বিমুখ হওয়া তাঁহার সাধ্য নহে–অপটুতা এবং দুর্যোধনকে বিপৎকালে পরিত্যাগ, এই উভয় দোষেই দূষিত হইতে হইবে। অতএব মৃত্যুই স্থির করিলেন। বোধ হয়, এতটুকু একটু কিংবদন্তী ছিল–তাহারই উপর মহাভারতের উপর স্তর নির্মিত হইয়াছিল। হয়ত, তাহাও যথার্থ ঘটনা নহে। বোধ হয়, যথার্থ ঘটনা এই পর্যন্ত যে, দ্রোণ যুদ্ধে দ্রুপদপুত্র কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন; পরে যাহা বলিতেছি, তাহাতে তাই বুঝায়; তার পর প্রবলপ্রতাপ পাঞ্চালবংশকে ব্রহ্মহত্যাকলঙ্ক হইতে উদ্ধৃত করিবার জন্য নানাবিধ উপন্যাস প্রস্তুত হইয়াছে।

(৪) এখন দেখা যাউক অনুক্রমণিকাধ্যায়ে, এবং পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে কি আছে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে এই মাত্র আছে যে–

"যদাশ্রৌষং দ্রোণমাচার্যমেকং ধৃষ্টদ্যুম্নেনাভ্যতিক্রম্য ধর্মম্।
রথোপস্থে প্রায়গতং বিশস্তং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় || "

অর্থ। হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম যে, এক আচার্য দ্রোণকে ধৃষ্টদ্যুম্ন ধর্মাতিক্রমপূর্বক প্রায়োপবিষ্ট অবস্থায় রথোপস্থে বধ করিয়াছে, তখন আর জয়ে সন্দেহ করি নাই।

অতএব এখানেও দেখা যাইতেছে যে, দ্রোণবধে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভিন্ন আর কেহ অধর্মাচরণ করে নাই। ধৃষ্টদ্যুম্নেরও পাপ এই যে, প্রায়োপবিষ্ট বৃদ্ধকে তিনি নিহত করিয়াছিলেন। দ্রোণের প্রায়োপবেশনের কারণ এখানে কিছু কথিত হয় নাই। যুধিষ্ঠিরবাক্যে বা ঋষিগণের বাক্যে বা ভীমের তিরস্কারে, তাহা কিছু কথিত হয় নাই। পশ্চাৎ দেখিব, তিনি পরে শ্রান্ত হইয়াই, নিহত হয়েন। আসন্নমৃত্যু ব্রাহ্মণের প্রায়োপবেশনের সেও উপযুক্ত কারণ।

(৫) পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে কোন কথাই নাই–"দ্রোণে যুধি নিপাতিতে," এ ছাড়া আর কিছুই নাই। হত গজের কথাটা সত্য হইলে, তাহার প্রসঙ্গ অবশ্যই থাকিত। অভিমন্যুর অধর্মযুদ্ধে মৃত্যুর কথা আছে–দ্রোণেরও অবশ্য থাকিত। গল্পটা তখনও তৈয়ার হয় নাই, এজন্য নাই।

(৬) তার পর, দ্রোণপর্বের সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে দ্রোণযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। তাহাতেও এই জুয়াচুরির কোন প্রসঙ্গ নাই। কেবল আছে যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে নিপাতিত করিলেন। এই অধ্যায়গুলি যখন প্রণীত হয়, তখনও গল্পটা তৈয়ার হয় নাই।

(৭) আশ্বমেধিক পর্বে আছে যে, কৃষ্ণও দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলে, বসুদেব কৃষ্ণের নিকট যুদ্ধবৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে যুদ্ধবৃত্তান্ত সংক্ষেপে শুনাইলেন। দ্রোণযুদ্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণ ইহাই বলিলেন যে, দ্রোণাচার্যে ও ধৃষ্টদ্যুম্নে পাঁচ দিন যুদ্ধ হয়। পরিশেষে দ্রোণ সমরশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নহস্তে নিহত হইলেন। বোধ হয়, এইটুকুই সত্য; এবং যুবার সহিত যুদ্ধে বৃদ্ধের শ্রান্তিই দ্রোণের যুদ্ধবিরতির যথার্থ কারণ। আর সকলই কবিকল্পনা বা উপন্যাস। নিতান্তই যে উপন্যাস, তাহার সাত রকম প্রমাণ দিলাম।

কিন্তু সেই উপন্যাস মধ্যে, কৃষ্ণকে মিথ্যা প্রবঞ্চনার প্রবর্তক বলিয়া স্থাপিত করিবার কারণ কি? কারণ পূর্বে বুঝাইয়াছি। বুঝাইয়াছি যে, যেমন জ্ঞান ঈশ্বরদত্ত, অজ্ঞান বা ভ্রান্তিও তাই। জয়দ্রথবধে কবি তাহা দেখাইয়াছেন। ভ্রান্তিও ঈশ্বরপ্রেরিত। ঘটোৎকচবধে কবি দেখাইয়াছেন যে, যেমন বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরিত, দুর্বুদ্ধিও ঈশ্বরপ্রেরিত। আরও বুঝাইয়াছি

যে, যেমন সত্যও ঈশ্বরের, অসত্যও তেমনই ঈশ্বরের। এই দ্রোণবধে কবি তাহাই দেখাইলেন।

ইহার পর, নারায়ণাস্ত্রমোক্ষ-পর্বাধ্যায়। সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বিস্তারিতের প্রয়োজন নাই, কেন না, নারায়ণাস্ত্র বৃত্তান্তটা অনৈসর্গিক, সুতরাং পরিত্যাজ্য। তবে এই পর্বাধ্যায়ে একটা রহস্যের কথা আছে।

দ্রোণ নিহত হইলে অর্জুন গুরুর জন্য শোকে অত্যন্ত কাতর। মিথ্যা কথা বলিয়া গুরুবধসাধনজন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে খুব তিরস্কার করিলেন, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের নিন্দা করিলেন। যুধিষ্ঠির ভাল মানুষ, কিছু উত্তর করিলেন না, কিন্তু ভীম অর্জুনকে কড়া রকম কিছু শুনাইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জুনকে আরও কড়া রকম শুনাইলেন। তখন অর্জুনশিষ্য যদুবংশীয়, সাত্যকি, অর্জুনের পক্ষ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে ভারি রকম গালিগালাজ দিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সুদ সমেত ফিরাইয়া দিলেন। তখন দুই জনে পরস্পরের বধে উদ্যত। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম ও সহদেব থামাইয়া দিলেন। বিবাদটা এই যে, মিথ্যা কথা বলিয়া দ্রোণের মৃত্যুসাধন করা কর্তব্য ও অকর্তব্য কি না, এই তত্ত্ব লইয়া দুই পক্ষে যত কথা আছে, সব বলিলেন, কিন্তু কেহই কৃষ্ণকে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। কেহই বলিলেন না যে, কৃষ্ণের কথায় এরূপ হইয়াছে। কৃষ্ণের নামও কেহ করিলেন না। পাঁচ হাতের কাজ না হইলে এমন ঘটে না।

----

* ঘটোৎকচবধ-পর্বাধ্যায়, ১৮২ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রবাক্য দেখ।

! গোপালভাঁড় এইরূপ "কৃষ্ণ পাইয়াছিল।"

!! "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ"-এ কথাটা মহাভারতের নহে। বোধ হয় কথকেরা তৈয়ার করিয়া থাকিবেন। মূল মহাভারতে ইহা নাই। মহাভারতে আছে,

তমতথ্যভয়ে মগ্নো জয়ে সক্তো যুধিষ্ঠিরঃ।

অব্যক্তমব্রবীদ্বাক্যং হতঃ কুঞ্জর ইত্যুত ‖ ১৯১ ||

** অর্জুন ও কৃষ্ণ ভীমকে বলপূর্বক রথ হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

রথগুলা যদি “এক্কার মত হয়, তবে এখনকার লোকেও ইহা পারে।

* ৩৪ পৃষ্ঠা (৬) সূত্র দেখ।

৩৩ পৃষ্ঠা (৪) সূত্র দেখ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণকথিত ধর্মতত্ত্ব

যিনি অশ্বত্থামাবধসংবাদ-বৃত্তান্ত রচনা করিয়াছেন, তিনি অর্জুনকে বড় উচ্চ স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও ভীমের অপেক্ষা তাঁহার ধার্মিকতা অনেক বেশী, এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। যাহার প্রস্তাবকর্তা কৃষ্ণ, এবং যাহা পরিশেষে ভীম ও যুধিষ্ঠির সম্পাদিত করিলেন, সে মিথ্যা কথা বলিয়া অর্জুন তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না; বরং তজ্জন্য যুধিষ্ঠিরকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। কিন্তু এক্ষণে যে বিবরণে আমাকে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে, তাহাতে অর্জুন অতি মূঢ় ও পাষণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। এবং কৃষ্ণের নিকট ধর্মোপদেশ পাইয়াই সৎপথ অবলম্বন করিতেছেন। বৃত্তান্তটা এই : –

দ্রোণের পর কর্ণ দুর্যোধনের সেনাপতি। তাঁহার যুদ্ধে পাণ্ডবসেনা অস্থির। যুধিষ্ঠির নিজ দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। কর্ণ তাঁহাকে এরূপ সন্তাড়িত করিলেন যে, যুধিষ্ঠির ভয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গিয়া শিবিরে লুক্কায়িত হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। এদিকে অর্জুন যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরকে না দেখিয়া চিন্তিত হইয়া তাঁহার অন্বেষণে শিবিরে গেলেন। তখনও কর্ণ নিহত হয়েন নাই। যুধিষ্ঠির যখন শুনিলেন যে, অর্জুন এখনও কর্ণবধ করেন নাই, তখন রাগিয়া বড় গরম হইলেন। কাপুরুষের স্বভাবই এই যে, আপনি যাহা না পারে, পরে তাহা করিয়া না দিলে চটিয়া উঠে। সুতরাং যুধিষ্ঠির অর্জুনকে খুব কঠিন গালিগালাজ করিলেন। শেষে বলিলেন যে, তুমি নিজে যখন যুদ্ধে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছ, তখন তুমি কৃষ্ণকে গাণ্ডীব শরাসন প্রদান কর।

শুনিয়া অর্জুন তরবারি লইয়া যুধিষ্ঠিরকে কাটিতে উঠিলেন। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তরবারি দিয়া কাহাকে বধ করিবে? অর্জুন বলিলেন, "তুমি অন্যকে গাণ্ডীব[1] শরাসন সমর্পণ কর, এই কথা যিনি আমারে কহিবেন, আমি তাঁহার মস্তক ছেদন করিব, এই আমার উপাংশুব্রত। এক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমারে এই কথা কহিয়াছেন,

অতএব আমি এই ধর্মভীরু নরপতিরে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন ও সত্যের আনৃণ্য লাভ করতঃ নিশ্চিন্ত হইব।”

কথাটা মূঢ় ও পাষণ্ডের মত হইল—অর্জ্জুনের মত নহে। একে ত, গাণ্ডীব অন্যকে দাও বলিলে কোন ব্যক্তিকে খুন করিতে হইবে, এ প্রতিজ্ঞাই মূঢ়তার কাজ। তার পর পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠাগ্রজ উত্তেজনার জন্য এরূপ কথা বলিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া অতিশয় পাষণ্ডের কাজ। তবে ইহার ভিতর গুরুতর কথা আছে; তাহার বিস্তারিত মীমাংসা কৃষ্ণ কর্তৃক হইয়াছিল, এই জন্য এ কথার অবতারণায় আমি বাধ্য।

কথাটা এই, সত্য পরম ধর্ম। যদি অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে বধ না করেন, তবে তাঁহাকে সত্যচ্যুত হইতে হয়। অর্জ্জুনের প্রশ্ন এই যে, সত্যরক্ষার্থ যুধিষ্ঠিরকে বধ করা তাঁহার কর্তব্য কি না। অর্জ্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার মতে এক্ষণে কি করা কর্তব্য?”

কৃষ্ণ যে উত্তর দিলেন, তাহা বুঝাইবার পূর্ব্বে, আমরা পাঠককে অনুরোধ করি যে, আপনিই ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করুন। বোধ করি, সকল পাঠকই একমত হইয় উত্তর দিবেন যে, এরূপ সত্যের জন্য যুধিষ্ঠিরকে বধ করা অর্জ্জুনের কর্তব্য নহে। কৃষ্ণও সেই উত্তর দিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য নীতিপণ্ডিত আধুনিক পাঠক যে কারণে এই উত্তর দিবেন, কৃষ্ণ সেই কারণে এ সকল উত্তর দিলেন না। তিনি প্রাচ্যনীতির বশবর্তী হইয়াই এই উত্তর দিলেন। তাহার কারণ বুঝাইতে হইবে না—বুঝাইতে হইবে না যে, শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষে অবতীর্ণ, ইংলণ্ডে নহে। তিনি ভারতবর্ষের নীতিতে সুপণ্ডিত, ইউরোপীয় নীতি তখন হয়ও নাই; এবং কৃষ্ণ তন্মার্গাবলম্বী হইলে অর্জ্জুনও তাহার কিছুই বুঝিতেন না।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুঝাইবার জন্য যে সকল তত্ত্বের অবতারণা করিলেন, এক্ষণে তাহার স্থূলমর্ম বলিতেছি—অন্ততঃ যে অংশ বিবাদের স্থল হইতে পারে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

তাঁহার পরম কথা “অহিংসা পরম ধর্ম”। ইহাতে প্রথম আপত্তি হইতে পারে যে, সকল স্থানে অহিংসা ধর্ম নহে। দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণ স্বয়ং গীতাপর্বাধ্যায়ে অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, এ উক্তি তাহার বিপরীত।

যিনি অহিংসাতত্ত্বের যথার্থ মর্ম না বুঝেন, তিনিই এরূপ আপত্তি করিবেন। অহিংসা পরম ধর্ম, এ কথায় এমন বুঝায় না যে, কোন অবস্থায় কোন প্রকারে প্রাণিহিংসা করিলে অধর্ম হয়। প্রাণিহিংসা ব্যতীত আমরা ক্ষণমাত্র জীবন ধারণ করিতে পারি না, ইহা ঐশিক নিয়ম। যে জল পান করি, তাহার সঙ্গে সহস্র সহস্র অণুবীক্ষণদৃশ্য জীব উদরস্থ করি; প্রতি নিশ্বাসে বহুসংখ্যক তাদৃক্ জীব নাসাপথে প্রেরিত করি, প্রতি পদার্পণে সহস্র সহস্রকে দলিত করি। একটি শাকের পাতা বা একটি বেগুনের সঙ্গে অনেকগুলিকে রাঁধিয়া খাই। যদি বল, এ সকল অজ্ঞানকৃত হিংসা, তাহাতে পাপ নাই; আমি তাহার উত্তরে বলি যে, জ্ঞানকৃত প্রাণিহিংসা ব্যতীতও আমাদের প্রাণরক্ষা নাই। যে বিষধর সর্প বা বৃশ্চিক, আমার গৃহে বা আমার শয্যাতলে আশ্রয় করিয়াছে আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে ব্যাঘ্র আমাকে গ্রহণ করিবার জন্য লম্ফনোদ্যত, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে শত্রু আমার বধসাধনে কৃতনিশ্চয় ও উদ্যতায়ুধ, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে দস্যু ধৃতাস্ত্র হইয়া নিশীথে আমার গৃহে-প্রবেশপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিতেছে, যদি বিনাশ ভিন্ন তাহাতে নিবারণের উপায় না থাকে, তবে তাহাকে বিনাশ করাই আমার পক্ষে ধর্ম্মানুগত। যে বিচারকের সম্মুখে হত্যাকারীকৃত হত্যা প্রমাণিত হইয়াছে, যদি তাহার বধদণ্ড রাজনিয়োগসম্মত হয়, তবে তিনি তাহার বধাজ্ঞা প্রচার করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। এবং সে রাজপুরুষের উপর বধার্হের বধের ভার আছে, সেও তাহাকে বধ করিতে বাধ্য। সেকেন্দর বা গজনবী মহম্মদ, আতিলা বা জঙ্গেজ, তৈমুর বা নাদের দ্বিতীয় ফ্রেড্রিক্ বা নাপোলেয়ন্ পরস্ব ও পররাষ্ট্রাপহরণ জন্য যে অগণিত শিক্ষিত তস্কর লইয়া পররাজ্যপ্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ লক্ষ হইলেও প্রত্যেকেই ধর্ম্মতঃ বধ্য। এখানে হিংসাই ধর্ম্ম।

পক্ষান্তরে, যে পাখিটি আকাশে উড়িয়া যাইতেছে, ভোজন জন্যই হউক বা খেলার জন্যই হউক, তাহার নিপাত অধর্ম্ম। যে মাছিটি মিষ্টবিন্দুর অন্বেষণে উড়িয়া বেড়াইতেছে, ক্রীড়াশীল বালক যে তাহাকে ধরিয়া টিপিয়া মারিল, তাহা অধর্ম্ম। যে মৃগ বা যে কুক্কুট তোমার আমার ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য জগতে আসিয়াছে, উদরম্ভরী যে তাহাকে বধ করিয়া খায়, সে অধর্ম্ম। আমরা বায়ুপ্রবাহের তলচারী জীব; মৎস্য, জলপ্রবাহের

উপরিচর জীব; মৎস্য, জলপ্রবাহের উপিচর জীব; আমরা তাহাদের ধরিয়া খাই, সে অধর্ম।

তবে অহিংসা পরম ধর্ম, এ বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, ধর্ম্য প্রয়োজন ব্যতীত যে হিংসা, তাহা হইতে বিরতিই পরম ধর্ম। নচেৎ হিংসাকারীর নিবারণ জন্য হিংসা অধর্ম নহে; বরং পরম ধর্ম। এই কথা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলাকের ইতিহাস শুনাইলেন। তাহার স্থূল তাৎপর্য এই যে, বলাক নামে ব্যাধ, প্রাণিগণের বিশেষবিনাশহেতু এক শ্বাপদকে বিনাশ করিয়াছিল, করিবামাত্র তাহার উপর "আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল, অপ্সরোদিগের অতি মনোরম গীত-বাদ্য আরম্ভ হইল, এবং সেই ব্যধকে স্বর্গে সমানীত করিবার নিমিত্ত বিমান সমুপস্থিত হইল।" ব্যাধের পুণ্য এই যে, সে হিংসাকারীর হিংসা করিয়াছিল।

অহিংসা পরম ধর্ম, এই অর্থে বুঝিতে হইবে। তবে, ধর্ম্য প্রয়োজন ভিন্ন হিংসা করিবে না, এ কথায় একটা ভারি গোলযোগ হয়, এবং জগতে চিরকাল হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্য প্রয়োজন কি? ধর্ম কি? Inquisition কর্তৃক মনুষ্যবধে ধর্ম্য প্রয়োজন আছে বলিয়া কোটি কোটি মনুষ্য যমপুরে প্রেরিত হইয়াছিল। ধর্মার্থই, St. Bartholomew হত্যাকাণ্ড। ধর্মাচরণ বিবেচনাতেই ক্রুসেডওয়ালাদিগের দ্বারা পৃথিবী নরশোণিত প্রবাহে পঙ্কিল হইয়াছিল। ধর্মবিস্তারের জন্য মুসলমানেরা লক্ষ লক্ষ মনুষ্যহত্যা করিয়াছিল। বোধ হয়, ধর্মপ্রয়োজন সম্বন্ধে ভ্রান্তিতে পড়িয়া মনুষ্য যত মনুষ্য নষ্ট করিয়াছে, তত মনুষ্য আর কোন কারণেই নষ্ট হয় নাই।

অর্জুনেরও এখন সেই ভ্রান্তি উপস্থিত। তিনি মনে করিয়াছেন যে, সত্যরক্ষাধর্মার্থ যুধিষ্ঠিরকে বধ করা কর্তব্য। অতএব কেবল অহিংসা পরম ধর্ম, এ কথা বলিলেও তাঁহার ভ্রান্তির দূরীকরণ হয় না। এই জন্য কৃষ্ণের দ্বিতীয় কথা।

সে দ্বিতীয় কথা এই যে, বরং মিথ্যা বাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু কখনই প্রাণিহিংসা করা কর্তব্য নহে।[3] ইহার স্থূল তাৎপর্য এই যে, অহিংসা ও সত্য, এই দুইয়ের মধ্যে অহিংসা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ইহার অর্থ এই:– নানাবিধ পুণ্য কর্মকে ধর্ম বলিয়া গণনা করা যায়; যথা–দান, তপ, দেবভক্তি, সত্য, শৌচ, অহিংসা ইত্যাদি। ইহার মধ্যে

সকলগুলি সমান নহে; ইতরবিশেষ হওয়াই সম্ভব। শৌচের মাহাত্ম্য বা দানের মাহাত্ম্য কি সত্যের সঙ্গে বা অহিংসার সঙ্গে এক? যদি তাহা না হয়, যদি তারতম্য থাকে, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? কৃষ্ণ বলেন, অহিংসা। সত্যের স্থান তাহার নীচে।

আমরা পাশ্চাত্ত্যের শিষ্য! অনেক পাঠক এই কথায় শিহরিয়া উঠিবেন। পাশ্চাত্ত্যেরা নাকি বলিয়া থাকেন, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা বলা যাইতে পারে না। তা না হয় হইল; সে কথা এখন উঠিতেছে না। এমন কেহই বলিবেন না যে, পাশ্চাত্ত্যদিগের মতে একজন মিথ্যাবাদী একজন হত্যাকারীর অপেক্ষা গুরুতর পাপী, অথবা মিথ্যাবাদী ও হত্যাকারী তুল্য পাপী। তাঁহারা যে তাহা বলেন না, সমস্ত ইউরোপীয় দণ্ডবিধিশাস্ত্র তাহার প্রমাণ। যদি তাই হইল, তবে এখন কৃষ্ণের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের শিষ্যগণের মতভেদের এখানে কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এখানে কেবল পাপের তারতম্যের কথা হইতেছে। কোন অধর্মই কোন সময়ে করিতে নাই। নরহত্যাও করিতে নাই, মিথ্যা কথাও বলিতে নাই। কৃষ্ণের কথার ফল এই যে, যদি এমন অবস্থা কাহারও ঘটে যে, হয় তাহাকে মিথ্যা কথা বলিতে হইবে, নয় নরহত্যা করিতে হইবে, তবে বরং মিথ্যা কথা বলিবে, তথাপি নরহত্যা করিবে না। যদি এরূপ ধর্মাত্মা নীতিজ্ঞ কেহ থাকেন যে, বলেন যে, বরং নরহত্যা করিবে, তথাপি মিথ্যা কথা বলিবে না, তবে আমাদের উত্তর এই যে, তাঁহার ধর্ম তাঁহাতেই থাক, এ নারকী ধর্ম যেন ভারতবর্ষে বিরলপ্রচার হয়।

কৃষ্ণের এই মত। যদি অর্জুন ইহার অনুবর্তী হইবেন, তবে ভ্রাতৃবধ-পাপ হইতে তাঁহাকে বিরত করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু অর্জুন বলিতে পারেন, "এ ত গেল তোমার মত। কিন্তু লৌকিক ও প্রচলিত ধর্ম কি? তোমার মতই যথার্থ হইতে পারে, কিন্তু ইহা যদি প্রচলিত ধর্মানুমোদিত না হয়, তবে আমি জনসমাজে সত্যচ্যুত পাপাত্মা বলিয়া কলঙ্কিত হইব।" এজন্য কৃষ্ণ আপনার মত প্রকাশ করিয়া প্রচলিত ধর্ম যাহা, তাহা বুঝাইতেছেন। তিনি বলিলেন, "হে ধনঞ্জয়! কুরুপিতামহ ভীষ্ম, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, বিদুর ও যশস্বিনী কুন্তী যে ধর্মরহস্য কহিয়াছেন, আমি যথার্থরূপে তাহাই কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই বলিয়া বলিলেন,

"সাধু ব্যক্তিই সত্য কথা কহিয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই।[2] সত্যতত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়। সত্যবাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্তব্য।"

এই গেল স্থূলনীতি। তারপর বর্জিত তত্ত্ব বলিতেছেন,

"কিন্তু যে স্থানে মিথ্যা সত্যস্বরূপ, ও সত্য মিথ্যাস্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে।"

কিন্তু কখন কি এমন হয়? এ কথাটা আবার উঠিবে, সেই সময়ে আমরা ইহার যথাসাধ্য বিচার করিব। তার পর কৃষ্ণ বলিতেছেন,

"বিবাহ রতিক্রীড়া, প্রাণবিয়োগ ও সর্বস্বাপহরণকালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ করিলেও পাতক হয় না।"

এখানে ঘোর বিবাদের স্থল, কিন্তু বিবাদ এখন থাক। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে উল্লিখিতরূপ আছে। উহা একটি শ্লোকের মাত্র অনুবাদ, কিন্তু মূলে ঐ বিষয়ে দুইটি শ্লোক আছে। দুইটি উদ্ধৃত করিতেছি;

১। প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ
সর্বস্বস্যাপহারে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ ||

২। বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে।
বিপ্রস্য চার্থে হ্যনৃতং বদেত পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ||

এই দুইটি শ্লোকের একই অর্থ; কেবল প্রথম শ্লোকটিতে ব্রাহ্মণের কথা নাই, এই প্রভেদ। এখন পাঠকের মনে এই প্রশ্ন আপনিই উদয় হইবে, একই অর্থবাচক দুইটি শ্লোকের প্রয়োজন কি?

ইহার উত্তর এই যে, এই দুইটিই অন্যত্র হইতে উদ্ধৃত—Quotation—কৃষ্ণের নিজোক্তি নহে। সংস্কৃতগ্রন্থে এমন স্থানে স্থানে দেখা যায় যে, অন্যত্র হইতে বচন ধৃত হয়, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বলা হয় না যে, এই বচন গ্রন্থান্তরের। এই মহাভারতীয় গীতা-পর্বাধ্যায়েই তাহার উদাহরণ গ্রন্থান্তরে দিয়াছি।

আমি আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছি না, এ বচন দুইটি অন্যত্র হইতে ধৃত। দ্বিতীয় শ্লোকটি, যথা—"বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে" ইত্যাদি—ইহা বশিষ্ঠের বচন। পাঠক

বশিষ্ঠের ১৬ অধ্যায়ে, ৩৫ শ্লোকে তাহা দেখিবেন; ইহা মহাভারতের আদিপর্বে, ৩৪১২ শ্লোকে, যেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, সেখানেও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়া উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা–

ন নর্মযুক্তং বচনং হিনস্তি নস স্ত্রীষু রাজন্ন বিবাহকালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ‖

চারিটি ভিন্ন পাঁচটির কথা এখানে নাই, তথাপি বশিষ্ঠের সেই "পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি" আছে। প্রচলিত বচন সকল মুখে মুখে এইরূপ বিকৃত হইয়া যায়।

প্রথম শ্লোকটির পূর্বগামী শ্লোকের সহিতে লিখিতেছি;

(ক) ভবেৎ সত্যমবক্তব্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
(খ) যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যঞ্চাপ্যনৃতং ভবেৎ ‖
(গ) প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
(ঘ) সর্বস্বস্যাপহারে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ ‖

এক্ষণে মহাভারতের সভাপর্ব হইতে একটি (১৩৮৪৪) শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি–কৃষ্ণের সহিত সেখানে কোন সম্বন্ধ নাই।

(চ) প্রাণান্তিকে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
(ছ) অনৃতেন ভবেৎ সত্যং সত্যেনৈবানৃতং ভবেৎ ‖

পাঠক দেখিবেন, (গ) ও (চ) আর (খ) (ছ) একই শব্দগুলিও প্রায় একই। অতএব ইহাও প্রচলিত পুরাতন বচন।

ইহা কৃষ্ণের মত নহে; নিজের অনুমোদিত নীতি বলিয়াও তাহা বলিতেছেন না; ভীষ্মাদি কাছে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন, নিজের অনুমোদিত হউক বা না হউক, কেন তিনি ইহা অর্জুনকে শুনাইতে বাধ্য, তাহা বলিয়াছি। সুতরাং কৃষ্ণচরিত্রে এ নীতির যাথার্থ্যাযা বিচারে কোন প্রয়োজন হইতেছে না।

কিন্তু আসল কথা বাকি আছে। আসল কথা, কৃষ্ণের নিজের মতও এই যে, অবস্থাবিশেষে সত্য মিথ্যা হয় এবং মিথ্যা সত্য হয়; এবং সে সকল স্থানে মিথ্যাই প্রযোক্তব্য। একথা তিনি পরে বলিতেছেন।

প্রথমে বিচার্য, কখনও কি মিথ্যা সত্য হয়, সত্য মিথ্যা হয়? ইহার স্থূল উত্তর এই যে, যাহা ধর্মানুমোদিত, তাহাই সত্য, আর যাহা অধর্মের অনুমোদিত, তাহাই মিথ্যা। ধর্মানুমোদিত মিথ্যা নাই; এবং অধর্মানুমোদিত সত্য নাই। তবে সত্যাসত্য মীমাংসা ধর্মাধর্ম মীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ধর্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতেছেন। কথাগুলাতে গীতার উদারনীতির গম্ভীর শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। বলিতেছেন,

"ধর্ম ও অধর্ম তত্ত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে অনুমান দ্বারাও নিতান্ত দুর্বোধ ধর্মের নির্ণয় করিতে হয়।"

ইহার অপেক্ষা উদার ইউরোপেও কিছু নাই। তার পর,

"অনেকে শ্রুতিরে ধর্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। তাহাতে আমি দোষারোপ করি না; কিন্তু শ্রুতিতে সমস্ত ধর্মতত্ত্ব নির্দিষ্ট নাই; এই জন্য অনেক স্থলে অনুমান দ্বারা ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়।"

এই কথাটা লইয়া আজিও সভ্যজগতে বড় গোলমাল। যাঁহারা বলেন যে, যাহা দৈবোক্তি বেদই হউক, বাইবেলই হউক, কোরাণই হউক,—তাহাতে যাহা আছে, তাহাই ধর্ম—তাহার বাহিরে ধর্ম কিছুই নাই—তাঁহারা আজিও বড় বলবান। তাঁহাদের মতে ধর্ম দৈবোক্তিনির্দিষ্ট অনুমানের বিষয় নহে। এ কথা মনুষ্যজাতির উন্নতির পথে বড় দুরুত্তীর্য কণ্টক। আমাদের দেশের কথা দূরে থাকুক, ইউরোপেও আজিও এই মত উন্নিতর পথ রোধ করিতেছে। আমাদের দেশের অবনতির ইহা একটি প্রধান কারণ। আজিও ভারতবর্ষের ধর্মজ্ঞান বেদ ও মনুযাজ্ঞবল্ক্যাদি স্মৃতির দ্বারা নিরুদ্ধ;—অনুমানের পথ নিষিদ্ধ। অতি দূরদর্শী মনুষ্যাদর্শ শ্রীকৃষ্ণ লোকোন্নতির এই বিষম ব্যাঘাত সেই অতি—প্রাচীন কালেও দেখিয়াছিলেন। এখন হিন্দুসমাজের ধর্মজ্ঞান দেখিয়া বিষণ্নমনে সেই শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ লইতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু অনুমানের একটা মূল চাহি। যেমন অগ্নি ভিন্ন ধূমোৎপত্তি হয় না, এই মূলের উপর অনুমান করি যে, সম্মুখস্থ ধূমবান্ পর্বত বহ্নিমান্‌ও বটে, তেমনি একটা লক্ষণ চাহি যে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে, এই কর্মটা ধর্ম বটে। শ্রীকৃষ্ণ তাহার লক্ষণ নির্দিষ্ট করিতেছেন।

"ধর্ম প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়া ধর্মনামে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম।"

এই হইল কৃষ্ণকৃত ধর্মের লক্ষণনির্দেশ। কথাটায়, এখনকার Herbert Spencer, Bentham, Mill ইতি সম্প্রদায়ের শিষ্যগণ কোন প্রকার অমত করিবেন না জানি। কিন্তু অনেকে বলিবেন, এ যে ঘোরতর হিতবাদ—বড় Utilitarian রকমের ধর্ম। বড় Utilitarian রকম বটে, কিন্তু আমি গ্রন্থান্তরে বুঝাইতেছি যে, ধর্মতত্ত্ব হিতবাদ হইতে বিযুক্ত করা যায় না; জগদীশ্বরের সার্বভৌতিকত্ব এবং সর্বময়তা হইতেই ইহাকে অনুমিত করিতে হয়। সঙ্কীর্ণ খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে হিতবাদের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু যে হিন্দুধর্মে বলে যে, ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, হিতবাদ সে ধর্মের প্রকৃত অংশ। এই কৃষ্ণবাক্যই যথার্থ ধর্মলক্ষণ।

পূর্বে বুঝাইয়াছি, যাহা ধর্মানুমোদিত, তাহাই সত্য; যাহা ধর্মানুমোদিত নহে, তাহাই মিথ্যা। অতএব যাহা সর্বলোকহিতকর, তাহাই সত্য, যাহা লোকের অহিতকর, তাহাই মিথ্যা। এই অর্থে, যাহা লৌকিক সত্য, তাহা ধর্মতঃ মিথ্যা হইতে পারে; এবং যাহা লৌকিক মিথ্যা, তাহা ধর্মতঃ সত্য হইতে পারে। এইরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্যস্বরূপ এবং সত্যও মিথ্যাস্বরূপ হয়।

উদাহরণ স্বরূপ কৃষ্ণ বলিতেছেন, যদি কেহ কাহারে বিনাশ করিবার মানসে কাহারও নিকট তাহার অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করাই উচিত। যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তবে সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই কর্তব্য। এইরূপ স্থলে মিথ্যা সত্যস্বরূপ হয়।

এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার পূর্বেই কৃষ্ণ কৌশিকের উপাখ্যান অর্জুনকে শুনাইয়া ভূমিকা করিয়াছিলেন। সে উপাখ্যান এই,

"কৌশিক নামে এক বহুশ্রুত তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদূরে নদীগণের সঙ্গমস্থানে বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ সর্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বনপূর্বক তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদা কতকগুলি লোক দস্যুভয়ে ভীত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলে, দস্যুরাও ক্রোধভরে যত্নসহকারে সেই বনে তাহাদিগকে অন্বেষণ করতঃ সেই সত্যবাদী কৌশিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, হে ভগবন্! কতকগুলি ব্যক্তি এই দিকে আগমন করিয়াছিল, তাহারা কোন্ পথে গমন করিয়াছে, যদি আপনি তাহা অবগত থাকেন, তাহা হইলে সত্য করিয়া বলুন। কৌশিক দস্যুগণকর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যপালনার্থে তাহাদিগকে কহিলেন, কতকগুলি লোক এই বৃক্ষ, লতা ও বৃক্ষপরিবেষ্টিত অটবীমধ্যে গমন করিয়াছে। তখন সেই ক্রূরকর্মা দস্যুগণ তাহাদের অনুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ ও বিনাশ করিল। সূক্ষ্মধর্মানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সেই সত্যবাক্যজনিত পাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন।"

এ স্থলে ইহা অভিপ্রেত যে, কৌশিক অবগত হইয়াছিলেন যে, ইহারা দস্যু; পলায়িত ব্যক্তিগণের অনিষ্ট ইহাদের উদ্দেশ্য—নহিলে তাঁহার কোন পাপই নাই। যদি তাহা অবগত ছিলেন, তবে তিনি কৃষ্ণের মতে সত্যকথনের দ্বারা পাপাচরণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে ঘোরতর মতভেদ। আমাদের প্রতীচ্য শিক্ষকদিগের নিকট শিখিয়াছি যে, সত্য নিত্য, কখন মিথ্যা হয় না, এবং কোন সময়ে মিথ্যা প্রযোক্তব্য নহে। সুতরাং কৃষ্ণের মত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট নিন্দিতই হইতে পারে। যাঁহারা ইহার নিন্দা করিবেন (আমি ইহা সমর্থনও করিতেছি না), তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কৌশিকের এ অবস্থায় কি করা উচিত ছিল? সহজ উত্তর মৌনাবলম্বন করা উচিত ছিল। সে কথা ত কৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—সে বিষয়ে মতভেদ নাই। যদি দস্যুরা মৌনী থাকিতে না দেয়? পীড়নাদির দ্বারা উত্তর গ্রহণ করে? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, পীড়ন ও মৃত্যু স্বীকার করিয়াও কৌশিকের মৌনরক্ষা করা উচিত ছিল। তাহাতেও আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। তবে জিজ্ঞাস্য এই, ঈদৃশ ধর্ম পৃথিবীতে সাধারণতঃ চলিবার সম্ভাবনা আছে কি না? ইহাতে সাংখ্যপ্রবচনকারের একটি সূত্র আমাদের মনে পড়িল। মহর্ষি কপিল

বলিয়াছেন, "নাশক্যোপদেশবিধিরুপদিষ্টেহপ্যনুপদেশঃ।"[4] এরূপ ধর্মপ্রচার চেষ্টা নিষ্ফল বলিয়া বোধ হয়। যদি সফল হয়, মানবজাতির পরম সৌভাগ্য।

কথাটা এখানে ঠিক তাহা নয়। কথাটা এই যে, যদি একান্তই কথা কহিতে হয়,

অবশ্যং কূজিতব্যে বা শঙ্কেরন্ বাপ্যকূজতঃ।

তাহা হইলে কি করিবে? সত্য বলিয়া জ্ঞানতঃ নরহত্যার সহায়তা করিবে? যিনি এইরূপে ধর্মতত্ত্ব বুঝেন, তাহার ধর্মবাদ যথার্থই হউক, অযথার্থই হউক, নিতান্ত নৃশংস বটে।

প্রতিবাদকারী বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণোক্ত এই নীতির একটি ফল এমন হয় যে, হত্যাকারীর জীবনরক্ষার্থ মিথ্যা শপথ করাও ধর্ম। যিনি এরূপ আপত্তি করিবেন, তিনি এই সত্যতত্ত্ব কিছুই বুঝেন নাই। হত্যাকারীর দণ্ড মনুষ্যজীবন রক্ষার্থ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, নহিলে যে যাহাকে পাইবে, মারিয়া ফেলিবে। অতএব হত্যাকারীর দণ্ডই ধর্ম; এবং তাহার রক্ষার্থ যে মিথ্যা বলে, সে অধর্ম করে।

কৃষ্ণোক্ত এই সত্যতত্ত্ব নির্দোষ এবং মনুষ্যসাধারণের অবলম্বনীয় কি না, তাহা আমি এক্ষণে বলিতে প্রস্তুত নহি। তবে কৃষ্ণচরিত্র বুঝাইবার জন্য উহা পরিস্ফুট করিতে আমি বাধ্য। কিন্তু ইহাও বলিতে আমি বাধ্য যে, পাশ্চাত্ত্যেরা যে কারণে বলেন যে, সত্য সকল সময়েই সত্য, কোন অবস্থাতেই অপরিহার্য নহে, তাহার মূলে একটা গুরুতর কথা আছে। কথাটা এই যে, ইহাই যদি ধর্ম-সত্য যেখানে মনুষ্যের হিতকারী, সেইখানেই ধর্ম, আর যেখানে মনুষ্যের হিতকারী নয়, সেখানে অধর্ম, ইহাই যদি ধর্ম হয়, তাহা হইলে মনুষ্যজীবন এবং মনুষ্যসমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে,–যে লোকহিত তোমার উদ্দেশ্য, তাহা ডুবিয়া যায়। অবস্থাবিশেষ উপস্থিত হইলে, সত্য অবলম্বনীয় বা মিথ্যা অবলম্বনীয়, এ কথার মীমাংসা কে করিবে? যে সে মীমাংসা করিবে। যে সে মীমাংসা করিতে বসিলে, মীমাংসা কখন ধর্মানুমোদিত হইতে পারে না। শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি অনেকেরই অতি সামান্য; কাহারও সম্পূর্ণ নহে। বিচারশক্তি অধিকাংশেরই আদৌ অল্প, তার উপর ইন্দ্রিয়ের বেগ, স্নেহ মমতার বেগ, ভয়, লোভ, মোহ ইত্যাদির প্রকোপ। সত্য নিত্যপালনীয়, এরূপ ধর্মব্যবস্থা না থাকিলে, মনুষ্যজাতি সত্যশূন্য হইবার সম্ভাবনা।

প্রাচীন হিন্দু ঋষিরা যে তাহা বুঝিতেন না, এমত নহে। বুঝিয়াই তাঁহারা বিশেষ করিয়া বিধান করিয়া দিয়াছেন, কোন্ কোন্ সময়ে মিথ্যা বলা যাইতে পারে। প্রাণাত্যয়ে ইত্যাদি সেই বিধি আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি। মনু, গৌতম প্রভৃতি ঋষিদিগেরও মতও সেই প্রকার। তাঁহারা যে কয়টি বিশেষ বিধি বলিয়াছেন, তাহা ধর্মানুমত কি না, তাহার বিচারে আমার প্রয়োজন নহে। কৃষ্ণকথিত সত্যতত্ত্ব পরিস্ফুট করাই আমার উদ্দেশ্য। কৃষ্ণও আধুনিক ইউরোপীয়দিগের ন্যায় বুঝিয়াছিলেন যে, বিশেষ বিধি ব্যতীত, এই সাধারণ বিধি কার্যে পরিণত করা, সাধারণ লোকের পক্ষে অতি দুরূহ। কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় প্রাণাত্যয়ে প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ অবস্থা নির্দেশ করিলেই লোককে ধর্মানুমত সত্যাচরণ বুঝানা যায় না। তিনি তৎপরিবর্তে কি জন্য, এবং কিরূপ অবস্থায় সাধারণ বিধি উল্লঙ্ঘন কর উচিত, তাহাই বলিতেছেন। আমরা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতেছি।

দান, তপ, শৌচ, আর্জব, সত্য প্রভৃতি অনেকগুলি কার্যকে ধর্ম বলা যায়। ইহার সকলগুলিই সাধারণতঃ ধর্ম, আবার সকলগুলিই অবস্থাবশেষে অধর্ম। অনুপযুক্ত প্রয়োগ বা ব্যবহারই অধর্ম। দান সম্বন্ধে উদাহরণ প্রয়োগ পূর্বক বলিতেছেন, “সমর্থ হইলেও চৌরাদিকে ধন দান করা কদাপি কর্তব্য নহে। পাপাত্মাদিগকে ধন দান করিলে অধর্মাচরণ নিবন্ধন দাতারও নিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয়।” সত্য সম্বন্ধেও সেইরূপ। শ্রীকৃষ্ণ তাহার যে দুইটি উদাহরণ দিয়াছেন, তাহার একটি উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, আর একটি এই;

“যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তি লাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্যস্বরূপ হয়। ”

ইহা ভিন্ন প্রচলিত ধর্মশাস্ত্র হইতে প্রাণাত্যয়ে বিবাহে ইত্যাদি কথা পুনরুক্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণকথিত সত্যতত্ত্ব এইরূপ। ইহার স্থূল তাৎপর্য এইরূপ বুঝা গেল যে,

১। যাহা ধর্মানুমোদিত, তাহাই সত্য, যাহা ধর্মবিরুদ্ধ, তাহা অসত্য।

২। যাহাতে লোকের হিত, তাহাই ধর্ম।

৩। অতএব যাহাতে লোকের হিত, তাহাই সত্য। যাহা তদ্বিরুদ্ধ, তাহা অসত্য।

৪। এইরূপ সত্য সর্বদা সর্বস্থানে প্রযোক্তব্য।

কৃষ্ণভক্ত বলিতে পারেন যে, ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সত্যতত্ত্ব কোথাও কথিত হইয়াছে, এমন যদি দেখাইতে পার, তবে আমরা কৃষ্ণের মত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। যদি তাহা না পার, তবে ইহাই আদর্শ মনুষ্যোচিত বাক্য বলিয়া স্বীকার কর।

উপসংহারে আমার ইহাও বক্তব্য যে, যদ্দ্বারা লোকরক্ষা বা লোকহিত সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম, আমরা যদি ভক্তি সহকারে এই কৃষ্ণোক্তি হিন্দুধর্মের মূলস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে হিন্দুধর্মের ও হিন্দুজাতির উন্নতির আর বিলম্ব থাকে না। তাহা হইলে, যে উপধর্মের ভস্মরাশিমধ্যে, পবিত্র এবং জগতে অতুল্য হিন্দুধর্ম প্রোথিত হইয়া আছে, তাহা অনল্পকালে কোথায় উড়িয়া যায়। তাহা হইলে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কুক্রিয়া, অনর্থক সামর্থ্যব্যয় ও নিষ্ফল কালাতিপাত, দেশ হইতে দূরীভূত হইয়া সৎকর্ম ও সদনুষ্ঠানে হিন্দুসমাজ প্রভান্বিত হইয়া উঠে। তাহা হইলে ভণ্ডামি, জাতি মারামারি, পরস্পরের বিদ্বেষ ও অনিষ্টচেষ্টা আর থাকে না। আমরা মহতী কৃষ্ণকথিতা নীতি পরিত্যাগ করিয়া, শূলপাণি ও রঘুনন্দনের পদানত—লোকহিত পরিত্যাগ করিযা তিথিতত্ত্ব মলমাসতত্ত্ব প্রভৃতি আটাইশ তত্ত্বের কচকচিতে মন্ত্রমুগ্ধ। আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে ত কোন্ জাতি অধঃপাতে যাইবে? যদি এখনও আমাদের ভাগ্যোদয় হয়, তবে আমরা সমস্ত হিন্দু একত্রিত হইয়া, নমো ভগবতে বাসুদেবায় বলিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রণাম করিয়া, তদুপদিষ্ট এ লোকহিতাত্মক ধর্ম গ্রহণ করিব।[5] তাহা হইলে নিশ্চিতই আমরা জাতীয় উন্নতি সাধিত করিতে পারিব।

----

1 পাঠককে বোধ করি বলিতে হইবে না, গাণ্ডীব অর্জুনের ধনুকের নাম। উহা দেবদত্ত, অবিনশ্বর এবং শরাসন মধ্যে ভয়ঙ্কর।

2 "ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।" ইতিপূর্বে কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "প্রাণিনামবধস্তাত সর্বজ্যায়ান্মতো মম।" এই দুইটি কথা পরস্পরবিরোধী। তাহার কারণ, একটি কৃষ্ণের মত, আর একটি ভীষ্মাদিকথিত প্রচলিত ধর্মনীতি।

3 যে বচনের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণকথিত এই ধর্মতত্ত্ব সংস্থাপিত হইতেছে, তাহার মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত করা কর্তব্য।

প্রাণিনামবধস্তাত সর্বজ্যায়ান্মতো মম।

অনৃতাং বা বদেদ্বাচং ন তু হিংস্যাৎ কথঞ্চন ‖

পাঠক দেখিবেন, অহিংসা পরমধর্ম, এটা কৃষ্ণবাক্যের ঠিক অনুবাদ নহে। ঠিক অনুবাদ–"আমার মতে প্রাণিগণের অহিংসা সর্ব হইতে শ্রেষ্ঠ।" অর্থগত বিশেষ প্রভেদ নাই বলিয়া "অহিংসা পরমধর্ম" ইতিপরিচিত বাক্যই ব্যবহার করিয়াছি।

4 প্রথম অধ্যায়, ৯ সূত্র।

5 বেন্থামের কথা ইংলণ্ড শুনিল–কৃষ্ণের কথা ভারতবর্ষ শুনিবে না?

সপ্তম পরিচ্ছেদ—কর্ণবধ

অর্জুন কৃষ্ণের কথা বুঝিলেন, কিন্তু অর্জুন ক্ষত্রিয়, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল। অতএব যাহাতে দুই দিক্ রক্ষা হয়, কৃষ্ণকে তাহার উপায় অবধারণ করিতে বলিলেন।

কৃষ্ণ বলিলেন, অপমান মাননীয় ব্যক্তির মৃত্যুস্বরূপ। তুমি যুধিষ্ঠিরকে অপমানসূচক একটা কথা বল, তাহা হইলেই, তাঁহাকে বধ করার তুল্য হইবে। অর্জুন তখন যুধিষ্ঠিরকে অপমানসূচক বাক্যে ভর্ৎসিত করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকে আবার এক বিপদে ফেলিলেন। বলিলেন, আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমানিত করিয়া গুরুতর পাপ করিয়াছি, অতএব আত্মহত্যা করিব। এই বলিয়া আবার অসি নিষ্কোষিত করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহারও মৃত্যু সোজা ব্যবস্থা করিলেন। বলিলেন, আত্মশ্লাঘা সজ্জনের মৃত্যুস্বরূপ। কথাটা কিছুমাত্র অন্যায় নহে। অর্জুন তখন অনেক আত্মশ্লাঘা করিলেন। তখন সব গোল মিটিয়া গেল।

কৃষ্ণ, অর্জুনের সারথি, কিন্তু যেমন অর্জুনের অশ্বের যন্তা, তেমনি এখন স্বয়ং অর্জুনেরও নিয়ন্তা। কখনও অর্জুনে আজ্ঞায় কৃষ্ণ রথ চালান, কখনও কৃষ্ণের আজ্ঞায় অর্জুন চলেন। এখন কৃষ্ণ, অর্জুনকে কর্ণবধে নিযুক্ত করিলেন।

এই কর্ণবধ মহাভারতের একটি প্রধান ঘটনা। বহুকাল হইতে ইহার সূত্রপাত হইয়া আসিতেছে। কর্ণই অর্জুনের প্রতিযোদ্ধা। ভীমার্জুন নকুল সহদেব চারি জনে যুধিষ্ঠিরের জন্য দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন, কর্ণ একাই দুর্যোধনের জন্য দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন। অর্জুন দ্রোণের শিষ্য, কর্ণদ্রোণগুরু পরশুরামের শিষ্য। অর্জুনের যেমন গাণ্ডীব ধনু ছিল, কর্ণের তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিজয় ধনু ছিল। অর্জুনের কৃষ্ণ সারথি, মহাবীর শল্য কর্ণের সারথি, উভয়ে অনেক দিব্যাস্ত্রে শিক্ষিত। উভয়েই পরস্পরের বধের জন্য বহুদিন হইতে প্রতিজ্ঞাত। অর্জুন ভীষ্মদ্রোণবধে কিছুমাত্র যত্নশীল ছিলেন না, কর্ণবধে তাঁহার দৃঢ় যত্ন। কুন্তী যখন কর্ণকে কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত অবগত করিয়া, তাঁহার নিকট আর পাঁচটি পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন, তখন কর্ণ যুধিষ্ঠির ভীম নকুল সহদেবের প্রাণ ভিক্ষা মাতাকে

দিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই অর্জ্জুনের প্রাণ ভিক্ষা দিলেন না। তাঁহাকে বধ করিবেন, না হয় তাঁহার হস্তে নিহত হইবেন, ইহা নিশ্চিত জানাইলেন।

সেই মহাযুদ্ধে অদ্য অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ লইয়া যাইলেন। ইহারই জন্য কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুধিষ্ঠিরের শিবিরে লইয়া আসিয়াছিলেন। ভীম অর্জ্জুনকে যুধিষ্ঠিরের সন্ধানে যাইতে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রণ শেষ না করিয়া অর্জ্জুনের আসিতে ইচ্ছা ছিল না। কৃষ্ণ জিদ করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত যে, কর্ণ ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হউন, অর্জ্জুন ততক্ষণ বিশ্রাম লাভ করিয়া পুনস্তেজস্বী হউন। এক্ষণে যুদ্ধে লইয়া যাইবার সময়ে আরও অর্জ্জুনের তেজোবৃদ্ধি জন্য অর্জ্জুনের বীরত্বের প্রশংসা করিলেন, এবং তাঁহার পূর্ব্বকৃত অতিদুর্দ্ধর্ষ কার্য সকল স্মরণ করাইয়া দিলেন। দ্রৌপদীর অপমান, অভিমন্যুর অন্যায়যুদ্ধে হত্যা প্রভৃতি কর্ণকৃত পাণ্ডবপীড়ন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ করাইয়া দিলেন। এই বক্তৃতার মধ্য হইতে কোন অংশ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই বক্তব্য, কৃষ্ণ বলিতেছেন, "পূর্ব্বে বিষ্ণু যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন," "পূর্ব্বে দানবগণ বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হইলে" ইত্যাদি বাক্যে বুঝিতে পারি যে, কৃষ্ণ এখনও আপনাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিচয় দেন না। দেবত্বে কোন অধিকার প্রকাশ করেন না, ইহা প্রথম স্তরের একটি লক্ষণ। দ্বিতীয় স্তরে, অন্য ভাব।

পরে কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহার বর্ণনায় আমার প্রয়োজন নাই। কথিত হইয়াছে যে, কর্ণের সর্পবাণ হইতে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন উহার নিবারণ করিতে পারেন নাই, অতএব কৃষ্ণ পদাঘাতে অর্জ্জুনের রথ ভূমিতে কিঞ্চিৎ বসাইয়া দিলেন, অশ্বগণ জানু পাতিয়া পড়িয়া গেল। অর্জ্জুনের মস্তক বাঁচিয়া গেল; কেবল কিরীট কাটা পড়িল। অর্জ্জুন নিজে মস্তক অবনত করিলেও সেই ফল হইত। কথাটা সমালোচনার যোগ্য নহে। তবে কৃষ্ণের সারথ্যের প্রশংসা মহাভারতে পুনঃ পুনঃ দেখা যায়।

যুদ্ধের শেষ ভাগে কর্ণের রথচক্র মাটিতে বসিয়া গেল। কর্ণ তাহা তুলিবার জন্য মাটিতে নামিলেন। যতক্ষণ রথচক্রের উদ্ধার না করেন, ততক্ষণ জন্য অর্জ্জুনের কাছে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অর্জ্জুনও ক্ষমা করিয়াছিলেন দেখা যাইতেছে, কেন না, কর্ণ

তাহার পর আবার রথে উঠিয়া পূর্ববৎ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কর্ণের দুর্ভাগ্য যে, ক্ষমা প্রার্থনাকালে তিনি অর্জুনকে এমন কথা বলিয়াছিলেন যে, ধর্মতঃ তিনি ঐ সময়ের জন্য কর্ণকে ক্ষমা করিতে বাধ্য; কৃষ্ণ অধর্মের শাস্তা। তিনি কর্ণকে তখন বলিলেন,

"হে সূতপুত্র! তুমি ভাগ্যক্রমে এক্ষণে ধর্ম স্মরণ করিতেছ। নীচাশয়েরা দুঃখে নিমগ্ন হইয়া প্রায়ই দৈবকে নিন্দা করিয়া থাকে; আপনাদিগকে দুষ্কর্মের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করে না। দেখ, দুর্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতানুসারে একবস্ত্রা দ্রৌপদীরে যে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন দুষ্ট শকুনি দুরভিসন্ধি-পরতন্ত্র হইয়া তোমার অনুমোদনে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন রাজা দুর্যোধন তোমার মতানুযায়ী হইয়া ভীমসেনকে বিষান্ন ভোজন করাইয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি বারণাবত নগরে জতুগৃহমধ্যে প্রসুপ্ত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্নিপ্রদান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি সভামধ্যে দুঃশাসনের বশীভূতা রজস্বলা দ্রৌপদীরে, হে কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি অন্য পতিরে বরণ কর, এই কথা বলিয়া উপহাস করিয়াছিলে এবং অনার্য ব্যক্তিরা তাঁহারে নিরপরাধে ক্লেশ প্রদান করিলে উপেক্ষা করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি রাজ্যলোভে শকুনিকে আশ্রয়পূর্বক পাণ্ডবগণকে দ্যূতক্রীড়া করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি মহারথগণসমবেত হইয়া বালক অভিমন্যুরে পরিবেষ্টন পূর্বক বিনাশ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? হে কর্ণ! তুমি যখন তত্তৎকালে অধর্মানুষ্ঠান করিয়াছ, তখন আর সময় ধর্ম ধর্ম করিয়া তালুদেশ শুষ্ক করিলে কি হইবে? তুমি যে এখন ধর্মপরায়ণ হইলেও জীবন সত্ত্বে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে, ইহা কদাচ মনে করিও না। পূর্বে নিষধদেশাধিপতি নল যেমন পুষ্কর দ্বারা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পুনরায় রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবগণও ভুজবলে সোমদিগের সহিত শত্রুগণকে বিনাশ করতঃ রাজ্যলাভ করিবেন। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ভুজবলে অবশ্যই ধর্মসংরক্ষিত পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইবে।"

কৃষ্ণের কথা শুনিয়া কর্ণ লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। তার পর পূর্বমত যুদ্ধ করিয়া, অর্জুনবাণে নিহত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—দুর্যোধনবধ

কর্ণ মরিলে, দুর্যোধন শল্যকে সেনাপতি করিলেন। পূর্বদিনের যুদ্ধে যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় হইয়া কাপুরুষতা-কলঙ্ক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ কলঙ্ক অপনীত করা নিতান্ত আবশ্যক। সর্বদর্শী কৃষ্ণ আজিকার প্রধান যুদ্ধে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। তিনিও সাহস করিয়া শল্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করিলেন।

সেই দিন সমস্ত কৌরবসৈন্য পাণ্ডবগণ কর্তৃক নিহত হইল। দুই জন ব্রাহ্মণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা, যদুবংশীয় কৃতবর্মা এবং স্বয়ং দুর্যোধন, এই চারি জন মাত্র জীবিত রহিলেন। দুর্যোধন পলাইয়া গিয়া দ্বৈপায়ন হ্রদে ডুবিয়া রহিল। পাণ্ডবগণ খুঁজিয়া যেখানে তাহাকে ধরিল। কিন্তু বিনা যুদ্ধে তাহাকে মারিল না।

যুধিষ্ঠিরের চিরকাল স্থূলবুদ্ধি, সেই স্থূলবুদ্ধির জন্যই পাণ্ডবদিগের এত কষ্ট। তিনি এই সময়ে সেই অপূর্ব বুদ্ধির বিকাশ করিলেন। তিনি দুর্যোধনকে বলিলেন, “তুমি অভীষ্ট আয়ুধ গ্রহণপূর্বক আমাদের মধ্যে যে কোন বীরের সহিত সমাগত হইয়া যুদ্ধ কর। আমরা সকলে রণস্থলে অবস্থানপূর্বক যুদ্ধ–ব্যাপার নিরীক্ষণ করিব। আমি কহিতেছি যে, তুমি আমদের মধ্যে একজনকে বিনাশ করিতে পারিলেই সমুদায় রাজ্য তোমার হইবে।” দুর্যোধন বলিলেন, আমি গদাযুদ্ধ করিব। কৃষ্ণ জানিতেন, গদাযুদ্ধে ভীম ব্যতীত কোন পাণ্ডবই দুর্যোধনের সমকক্ষ নহে। দুর্যোধন অন্য কোন পাণ্ডবকে যুদ্ধে আহত করিলে, পাণ্ডবদিগের আবার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। কেহ কিছু বলিলেন না, সকলেই বলদৃপ্ত; যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনার ভার কৃষ্ণই গ্রহণ করিলেন। সেই কার্য তিনি বিশিষ্ট প্রকারে নির্বাহ করিলেন।

দুর্যোধনও অতিশয় বলদৃপ্ত, সেই দর্পে যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধির দোষ সংশোধন হইল। দুর্যোধন বলিলেন, যাহার ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। সকলকেই বধ করিব। তখন ভীমই গদা লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

এখানে আবার মহাভারতের সুর বদল। আঠার দিন যুদ্ধ হইয়াছে, ভীম দুর্যোধনেই সর্বদাই যুদ্ধ হইয়াছে, গদাযুদ্ধও অনেক বার হইয়াছে, এবং বরাবরই দুর্যোধনই গদাযুদ্ধে ভীমের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আজ সুর উঠিল যে, ভীম গদাযুদ্ধে দুর্যোধনের তুল্য নহে। আজ ভীম পরাভূতপ্রায়। আসল কথাটা ভীমের সেই দারুণ প্রতিজ্ঞা। সভাপর্বে যখন দ্যূতক্রীড়ার পর, দুর্যোধন দ্রৌপদীকে জিতিয়া লইল, যখন দুঃশাসন একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করিয়া সভামধ্যে আনিয়া বিবস্ত্রা করিতেছিলেন, তখন ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি দুঃশাসনকে বধ করিয়া তাহার বুক চিরিয়া রক্ত খাইব। ভীম মহাশ্মশানতুল্য বিকট রণস্থলে দুঃশাসনকে নিহত করিয়া রাক্ষসের মত তাহার তপ্ত শোণিত পান করিয়া, সকলকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, আমি অমৃত পান করিলাম। দুর্যোধন সেই সভামধ্যে "হাসিতে হাসিতে দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ বসন উত্তোলনপূর্বক সর্বলক্ষণসম্পন্ন বজ্রতুল্য দৃঢ় কদলীদণ্ড ও করিশুণ্ডের ন্যায় স্বীয় মধ্য ঊরু তাঁহাকে দেখাইলেন।" তখন ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি মহাযুদ্ধে গদাঘাতে ঐ ঊরু যদি ভগ্ন না করি, তবে আমি যেন নরকে যাই।

আজি সেই ঊরু গদাঘাতে ভাঙ্গিতে হইবে। কিন্তু একটা তাহার বিশেষ প্রতিবন্ধক- গদাযুদ্ধের নিয়ম এই যে, নাভির অধঃ গদাঘাত করিতে নাই—তাহা হইলে অন্যায় যুদ্ধ করা হয়। ন্যায়যুদ্ধে ভীম দুর্যোধনকে মারিতে পারিলেও, প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইবে না।

যে জ্যেষ্ঠতাতপুত্রের হৃদয়রুধির পান করিয়া নৃত্য করিয়াছে, সে রাক্ষসের কাছে মাথায় গদাঘাত ও ঊরুতে গদাঘাতে তফাৎ কি? যে বৃকোদর দ্রোণভয়ে মিথ্যাপ্রবঞ্চনার সময়ে প্রধান উদ্যোগী বলিয়া চিত্রিত হইয়াছেন, তিনি ঊরুতে গদাঘাতের জন্য অন্যের উপদেশসাপেক্ষ হইতে পারেন না। কিন্তু সেরূপ কিছু হইল না। ভীম ঊরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলেন। বলিয়াছি, দ্বিতীয় স্তরের কবি (এখানে তাঁহারই হাত দেখা যায়) চরিত্রের সুসঙ্গতি রক্ষণে সম্পূর্ণ অমনোযোগী। তিনি এখানে ভীমের চরিত্রের কিছুমাত্র সুসঙ্গতি রাখিলেন না; অর্জুনেরও নহে। ভীম ভুলিয়া গেলেন যে, ঊরুভঙ্গ করিতে হইবে; আর যে পরমধার্মিক অর্জুন, দ্রোণবধের সময়, তাঁহার অস্ত্রগুরু, ধর্মের আচার্য, সখা, এবং পরমশ্রদ্ধার পাত্র কৃষ্ণের কথাতেও মিথ্যা বলিতে স্বীকৃত হয়েন নাই, তিনি এক্ষণে

স্বেচ্ছাক্রমে অন্যায়যুদ্ধে ভীমকে প্রবর্তিত করিলেন। কিন্তু কথাটা কৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন না হইলে, কবির উদ্দেশ্য সফল হয় না। অতএব কথাটা এই প্রকারে উঠিল–

অর্জুন ভীম-দুর্যোধনের যুদ্ধ দেখিয়া কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহাদিগের মধ্যে গদাযুদ্ধে কে শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ বলিলেন, ভীমের বল বেশী, কিন্তু দুর্যোধনের গদাযুদ্ধে যত্ন ও নৈপুণ্য অধিক। বিশেষ যাহারা প্রথমতঃ প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া পুনরায় সমরে শত্রুগণের সম্মুখীন হয়, তাহাদিগকে জীবিতনিরপেক্ষ ও একাগ্রচিত্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। জীবিতাশানিরপেক্ষ হইয়া সাহস সহকারে যুদ্ধ করিলে, সংগ্রামে সে বীরকে কেহই পরাভব করিতে পারে না। অতএব যদি ভীম দুর্যোধনকে অন্যায়যুদ্ধে সংহার না করেন, তবে দুর্যোধন জয়ী হইয়া যুধিষ্ঠিরের কথামত পুনর্বার রাজ্যলাভ করিবে।

কৃষ্ণের এইরূপ কথা শুনিয়া অর্জুন “স্বীয় বাম জানু আঘাত করতঃ ভীমকে সঙ্কেত করিলেন।” তার পর ভীম দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ করিয়া তাহাকে নিপাতিত করিলেন।

যেমন ন্যায় ঈশ্বরপ্রেরিত, অন্যায়ও তেমনি ঈশ্বরপ্রেরিত। ইহাই এখানে দ্বিতীয় স্তরের কবির উদ্দেশ্য।

যুদ্ধকালে দর্শকমধ্যে, বলরাম উপস্থিত ছিলেন। ভীম ও দুর্যোধন উভয়েই গদাযুদ্ধে তাহার শিষ্য। কিন্তু দুর্যোধনই প্রিয়তর। রেবতীবল্লভ সর্বদাই দুর্যোধনের পক্ষপাতী। এক্ষণে দুর্যোধন, ভীম কর্তৃক অন্যায়যুদ্ধে নিপাতিত দেখিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, লাঙ্গল উঠাইয়া তিনি ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। বলা বাহুল্য যে, বলরামের স্কন্ধে সর্বদাই লাঙ্গল, এই জন্য তাঁহার নাম হলধর। কেন তাঁহার এ বিড়ম্বনা, যদি কেহ এ কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাহার কিছু উত্তর দিতে পারিব না। যাই হউক, কৃষ্ণ বলরামকে অনুনয় বিনয় করিয়া কোনরূপে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। বলরাম কৃষ্ণের কথায় সন্তুষ্ট হইলেন না। রাগ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

তার পর একটা বীভৎস ব্যাপার উপস্থিত হইল। ভীম, নিপাতিত দুর্যোধনের মাথায় পদাঘাত করিতেছিলেন। যুধিষ্ঠির নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীম তাহা শুনেন নাই। কৃষ্ণ তাঁহাকে এই কদর্য আচরণে নিযুক্ত দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ না করার জন্য

যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করিলেন। এদিকে, পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ দুর্যোধনের নিপাত জন্য ভীমের বিস্তর প্রশংসা ও দুর্যোধনের প্রতি কটূক্তি করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন,

"মৃতকল্প শত্রুর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে।"

কৃষ্ণের এই সকল কথা কৃষ্ণের ন্যায় আদর্শ পুরুষের উচিত। কিন্তু ইহার পর যাহা গ্রন্থমধ্যে পাই, তাহা অতিশয় আশ্চর্য ব্যাপার।

প্রথম আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, কৃষ্ণ অন্যকে বলিলেন, "মৃতকল্প শত্রুর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে।" কিন্তু ইহা বলিয়াই নিজে দুর্যোধনকে কটূক্তি করিতে লাগিলেন।

দুর্যোধনের উত্তর দ্বিতীয় আশ্চর্য ব্যাপার। দুর্যোধন তখনও মরেন নাই, ভগ্নোরু হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণের কটূক্তি শুনিয়া কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন,

"হে কংসদাসতনয়! ধনঞ্জয় তোমার বাক্যানুসারে বৃকোদরকে আমার উরু ভগ্ন করিতে সঙ্কেত করাতে ভীমসেন অধর্মযুদ্ধে আমারে নিপাতিত করিয়াছে, ইহাতে তুমি লজ্জিত হইতেছ না। তোমার অন্যায় উপায় দ্বারাই প্রতিদিন ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত সহস্র নরপতি নিহত হইয়াছেন।* তুমি শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয়া পিতামহকে নিপাতিত করিয়াছ।# অশ্বত্থামা নামে গজ নিহত হইলে তুমি কৌশলেই আচার্যকে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়াছিলে এবং সেই অবসরে দুরাত্মা ধৃষ্টদুম্ন সমক্ষে আচার্যকে নিহত করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে নিষেধ কর নাই।** কর্ণ অর্জুনের বিনাশার্থ বহুদিন অতি যত্নসহকারে যে শক্তি রাখিয়াছিলেন, তুমি কৌশলক্রমে সেই শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করাইয়া, ব্যর্থ করাইয়াছ।## সাত্যকি তোমারই প্রবর্তনাপরতন্ত্র হইয়া ছিন্নহস্ত প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবারে নিহত করিয়াছিলেন।! মহাবীর কর্ণ অর্জুনবধে সমুদ্যত হইলে, তুমি কৌশলক্রমে তাহার সর্পবাণ ব্যর্থ করিয়াছ।!! এবং পরিশেষে সূতপুত্রের রথচক্র ভূগর্ভে প্রবিষ্ট ও তিনি চক্রোদ্ধারের নিমিত্ত ব্যস্তসমস্ত হইলে তুমি কৌশলক্রমে অর্জুন দ্বারা তাঁহার বিনাশ সাধনে কৃতকার্য হইয়াছ।*** অতএব তোমার তুল্য পাপাত্মা, নির্দয় ও নির্লজ্জ আর কে আছে? দেখ, তোমরা যদি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমার সহিত ন্যায়যুদ্ধ করিতে,

তাহা হইলে কদাপি জয়লাভে সমর্থ হইতে না। তোমার অনার্য উপায় প্রভাবেই আমরা স্বধর্মানুগত পার্থিবগণের সহিত নিহত হইলাম।”

এই বাক্যপরম্পরা সম্বন্ধে আমি যে কয়েকটি ফুটনোট দিলাম, পাঠকের তৎপ্রতি মনোযোগ করিতে হইবে। বাক্যগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এরূপ সম্পূর্ণ মিথ্যা তিরস্কার মহাভারতে আর কোথাও নাই। তাহাই বলিতেছিলাম যে, দুর্যোধনের উত্তর আশ্চর্য।

তৃতীয় আশ্চর্য ব্যাপার এই যে কৃষ্ণ ইহার উত্তর করিলেন। পূর্বে দেখিয়াছি, তিনি গম্ভীরপ্রকৃতি ও ক্ষমাশীল, কাহার কৃত তিরস্কারের উত্তর করেন না। সভামধ্যে শিশুপালকৃত অসহ্য নিন্দাবাদ বিনাবাক্যব্যয়ে সহ্য করিয়াছিলেন। বিশেষ, দুর্যোধন এখন মুমূর্ষু তাহার কথার উত্তরের কোন প্রয়োজন নাই; তাহাকে কোন প্রকারে কটূক্তি করা কৃষ্ণ নিজেই নিন্দনীয় বিবেচনা করেন। তথাপি কৃষ্ণ দুর্যোধনকৃত তিরস্কারের উত্তরও করিলেন, এবং কটূক্তিও করিলেন। উত্তরে দুর্যোধনকৃত পাপাচার সকল বিবৃত করিয়া উপসংহারে বলিলেন, “বিস্তর অকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে তাহার ফলভোগ কর।”

উত্তরে দুর্যোধন বলিলেন, আমি অধ্যয়ন, বিধিপূর্বক দান, সসাগরা বসুন্ধরার শাসন, বিপক্ষগণের মস্তকোপরি অবস্থান, অন্য ভূপালের দুর্লভ দেবভোগ্য সুখসম্ভোগ, ও অত্যুৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছি, পরিশেষে ধর্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়গণের প্রার্থনীয় সমরমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আমার তুল্য সৌভাগ্যশালী আর কে হইবে? এক্ষণে আমি ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত স্বর্গে চলিলাম, তোমরা শোকাকুলিতচিত্ত মৃতকল্প হইয়া এই পৃথিবীতে অবস্থান কর।”

এই উত্তর আশ্চর্য নহে। যে সর্বস্ব পণ করিয়া হারিয়াছে, সে যদি দুর্যোধনের মত দাম্ভিক হয়, তবে সে যে জয়ী শত্রুকে বলিবে, আমিই জিতিয়াছি, তোমরা হারিয়াছ, ইহা আশ্চর্য নহে। দুর্যোধন এইরূপ কথা হ্রদে থাকিয়াও বলিয়াছিল। যুদ্ধে মরিলে যে স্বর্গলাভ হয়, সকল ক্ষত্রিয়ই বলিত। উত্তর আশ্চর্য নহে, কিন্তু উত্তরের ফল সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য। এই কথা বলিবা মাত্র “আকাশ হইতে সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। গন্ধর্বগণ সুমধুর বাদিত্রবাদন ও অপ্সরা সকল রাজা দুর্যোধনের যশোগান করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধগণ তাঁহারে সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। সুগন্ধসম্পন্ন সুখস্পর্শ সমীরণ মন্দ মন্দ

সঞ্চারিত হইতে লাগিল। দিঙ্‌মণ্ডল ও নভোমণ্ডল সুনির্মল হইল। তখন বাসুদেবপ্রমুখ পাণ্ডবগণ সেই দুর্যোধনের সম্মানসূচক অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইলেন। এবং তাঁহারা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ভূরিশ্রবারে অধর্মযুদ্ধে বিনাশ করিয়াছেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।"

যিনি মহাভারতের সর্ব পাপাত্মার অধম-পাপাত্মা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহার এরূপ অদ্ভুত সম্মান ও সাধুবাদ, আর যাঁহারা সকল ধর্মাত্মার শ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মা বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহাদের এই অধর্মাচরণ জন্য লজ্জা, মহাভারতে আশ্চর্য। সিদ্ধগণ, অপ্সরাগণ, দেবগণ মিলিয়া প্রকটিত করিতেছেন, দুরাত্মা দুর্যোধন ধর্মাত্মা, আর কৃষ্ণপাণ্ডব মহাপাপিষ্ঠ। ইহা মহাভারতে আশ্চর্য, কেন না, ইহা সমস্ত মহাভারতের বিরোধী। সিদ্ধগণাদি দূরে থাক, কোন মনুষ্য দ্বারা এরূপ সাধুবাদ মহাভারতে আশ্চর্য বলিয়া বিবেচ্য, কেন না, মহাভারতের উদ্দেশ্যই দুর্যোধনের অধর্ম ও কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের ধর্ম কীর্তন। রসের উপর রসের কথা, তাঁহারা দুর্যোধন–মুখে শুনিলেন যে, তাঁহারা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভূরিশ্রবাকে অধর্মযুদ্ধে বধ করিয়াছেন; অমনি শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এত কাল তাঁহারা কিছুই জানিতেন না, এখন পরম শত্রুর মুখে জানিয়া, ভদ্রলোকের মত, শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, ভীষ্ম বা কর্ণকে তাঁহারা কোন প্রকার অধর্ম করিয়া মারেন নাই, কিন্তু পরম শত্রু দুর্যোধন বলিতেছে, তোমরা অধর্ম করিয়া মারিয়াছ, কাজেই তাহাতে অবশ্য বিশ্বাস করিলেন; অমনি শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, ভূরিশ্রবাকে তাঁহারা কেহই বধ করেন নাই–সাত্যকি করিয়াছিলেন, সাত্যকিকে বরং কৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীম নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি যখন পরমশত্রু দুর্যোধন বলিতেছে, তোমরাই মারিয়াছ, আর তোমরাই অধর্মাচরণ করিয়াছ, তখন গোবেচারা পাণ্ডবেরা অবশ্য বিশ্বাস করিতে বাধ্য যে, তাঁহারাই মারিয়াছেন, এবং তাঁহারাই অধর্ম করিয়াছেন; কাজেই তাঁহারা ভদ্রলোকের মত কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। এ ছাই ভস্ম মাথামুণ্ডের সমালোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। তবে এ হতভাগ্য দেশের লোকের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু পুঁথির ভিতর পাওয়া যায়, তাহাই ঋষিবাক্য, অভ্রান্ত, শিরোধার্য। কাজেই এ বিড়ম্বনা স্বেচ্ছাপূর্বক আমাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

আশ্চর্য কথাগুলো এখনও শেষ হয় নাই, কৃষ্ণ ত স্বকৃত অধর্মাচরণ জন্য লজ্জিত হইলেন, আবার সেই সময়ে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে পাণ্ডবদিগের কাছে সেই পাপাচরণ জন্য আত্মশ্লাঘা করিতে লাগিলেন।*

বলা বাহুল্য যে, দুর্যোধনকৃত তিরস্কারাদি বৃত্তান্ত সমস্তই অমৌলিক। দ্রোণবধাদি যে অমৌলিক, তাহা আমি পূর্বে প্রমাণীকৃত করিয়াছি। যাহা অমৌলিক, তাহার প্রসঙ্গ যে অংশে আছে, তাহাও অবশ্য অমৌলিক। কেবল এতটুকু বলা আবশ্যক যে, এখানে দ্বিতীয় স্তরের কবিরও লেখনীচিহ্ন দেখা যায় না। এ তৃতীয় স্তরের বলিয়া বোধ করা যায়। দ্বিতীয় স্তরের কবি কৃষ্ণভক্ত, এই লেখক কৃষ্ণদ্বেষক। শৈবাদি অবৈষ্ণব বা বৈষ্ণবদ্বেষিগণও স্থানে স্থানে মহাভারতের কলেবর বাড়াইয়াছেন, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। তাঁহারা কেহ এখানে গ্রন্থকার ইহাই সম্ভব। আবার এ কাজ কৃষ্ণভক্তের, ইহাও অসম্ভব নহে। নিন্দাচ্ছলে স্তুতি করা ভারতবর্ষীয় কবিদের একটা বিদ্যার মধ্যে।# এ তাও হইতে পারে।

সে যাই হউক, ইহার পরেই আবার দেখিতে পাই যে, দুর্যোধন অশ্বত্থামার নিকট বলিতেছেন, "আমি অমিততেজা বাসুদেবের মাহাত্ম্য বিলক্ষণ অবগত আছি। তিনি আমারে ক্ষত্রিয়ধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট করেন নাই। অতএব আমার জন্য শোক করিবার প্রয়োজন কি?"

এমন বারোইয়ারি কাণ্ডের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা নয়?

----

* এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ মহাভারতে কোথাও নাই। কোন স্তরেই না।

কৃষ্ণ ইহার বিন্দুবিসর্গেও ছিলেন না। মহাভারতে কোথাও এমন কথা নাই।

** শত্রুকে বধ করিতে কেন নিষেধ করিবেন?

কৃষ্ণ তজ্জন্য কোন যত্ন বা কৌশল করেন নাই। মহাভারতে ইহাই আছে যে, কৌরবগণের অনুরোধানুসারেই কর্ণ ঘটোৎকচের প্রতি শক্তি প্রয়োগ করিলেন।

! কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এমন কথা মহাভারতে কোথাও নাই। সাত্যকি ভূরিশ্রবাকে নিহত করিয়াছিলেন বটে। কৃষ্ণ বরং ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবাকে নিহত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

!! সে কৌশল, নিজপদবলে রথচক্র ভূপ্রোথিত করা। এ উপায় অতি ন্যায্য এবং সারথির ধর্ম, রথীর রক্ষা।

*** কি কৌশল? মহাভারতে এ সম্বন্ধে কৃষ্ণকৃত কোন কৌশলের কথা নাই। যুদ্ধে অর্জুন কর্ণকে নিহত করিয়াছিলেন, ইহাই আছে।

* যথা, "ভীষ্মপ্রমুখ মহারথগণ ও রাজা দুর্যোধন অসাধারণ সমরবিশারদ ছিলেন, তোমরা কদাচ তাঁহাদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতে না। আমি কেবল তোমাদের হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র হইয়া অনেক উপায় উদ্ভাবন ও মায়াবল প্রকাশপূর্বক তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছি। আমি যদি ঐরূপ কুটিল ব্যবহার না করিতাম, তাহা হইলে তোমাদিগের জয়লাভ, রাজ্যলাভ ও অর্থলাভ কখনই হইত না। দেখ, ভীষ্ম প্রভৃতি সেই চারি মহাত্মা ভূমণ্ডলে অতিরথ বলিয়া প্রথিত আছেন। লোকপালগণ সমবেত হইয়াও তাঁহাদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত করিতে সমর্থ হইতেন না। আর দেখ, সমরে অপরিশ্রান্ত গদাধরী এই দুর্যোধনকে দণ্ডধারী কৃত্তান্তও ধর্ম্মযুদ্ধে বিনষ্ট করিতে পারেন না; অতএব ভীম যে উহারে অসৎ উপায় অবলম্বনপূর্বক নিপাতিত করিয়াছেন, সে কথা আর আন্দোলন করিবার আবশ্যক নাই। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগকে কূট যুদ্ধে বিনাশ করিবে। মহাত্মা সুরগণ কূট যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াই অসুরগণকে নিহত করিয়াছিলেন; তাঁহাদের অনুকরণ করা সকলেরই কর্তব্য।" এমন নির্লজ্জ অধর্ম্ম আর কোথাও শুনা যায় না।

একটা উদাহরণ না দিলে, অনেক পাঠক বুঝিতে পারিবেন না; স্মর ভস্মীভূত হওয়ার পর বিলাপকালে রতির মুখে ভারতচন্দ্র বলিতেছেন,

"একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুন।"

ইহা আগুনকে গালি বটে, কিন্তু একটু ভাষান্তর করিলেই স্তুতি, যথা–

"হে অগ্নে! তুমি শম্ভুললাটবিহারী লোকধ্বংসকারী, তোমার শিখা জ্বালাবিশিষ্ট হউক।" পাঠক, ভারতচন্দ্রপ্রণীত অন্নদামঙ্গলে দক্ষকৃত শিবনিন্দা দেখিবেন। গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধিভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

নবম পরিচ্ছেদ—যুদ্ধশেষ

অন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধন হত হইয়াছে বলিয়া যুধিষ্ঠিরের ভয় হইল যে, তপঃপ্রভাবশালিনী গান্ধারী শুনিয়া পাণ্ডবদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। এ জন্য তিনি কৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি হস্তিনায় গমন করিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে শান্ত করিয়া আসুন।

কথাটা প্রথম স্তরের নয়, কেন না, এখানে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিতেছেন, "তুমি অব্যয়, এবং লোকের সৃষ্টি ও সংহারকর্তা" ইহার কিছু পূর্বেই অর্জুনের রথ হইতে কৃষ্ণ অবতরণ করায় সে রথ জ্বলিয়া গিয়াছিল। অর্জুনের জিজ্ঞাসা মতে কৃষ্ণ বলিলেন, "ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভাবে পূর্বেই এই রথে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছিল। কেবল আমি উহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলাম বলিয়া এ কাল পর্যন্ত দগ্ধ হয় নাই" অর্থাৎ আমি দেবতা বা বিষ্ণু। ইহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তর।

কৃষ্ণ হস্তিনায় গিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে কিছু বুঝাইলেন। উদ্ধৃত করা বা সমালোচনার যোগ্য কোন কথা নাই।

তার পর, দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু তখন সেনার মধ্যে সেই অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা। এইখানে শল্যপর্ব শেষ।

তাহার পর, সৌপ্তিক পর্ব। সৌপ্তিকপর্ব, অতি ভীষণ ব্যাপারে পরিপূর্ণ। প্রথমাংশে অশ্বত্থামা চোরের মত নিশীথ কালে পাণ্ডবশিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া নিদ্রাভিভূত ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, এবং সমস্ত পাঞ্চালগণকে, সেনা ও সেনাপতিগণকে বধ করিলেন। পঞ্চ পাণ্ডব ও কৃষ্ণ ভিন্ন পাণ্ডবপক্ষে আর কেহ রহিল না।

বস্তুতঃ এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ। পাঞ্চালেরা নির্বংশ হইলে যুদ্ধ শেষ হইল।

তাহার পরে, সৌপ্তিক পর্বে একটা ঐষীক পর্বাধ্যায় আছে। অশ্বত্থামা এই চোরোচিত কার্য করিয়া পাণ্ডবদিগের ভয়ে বনে গিয়া লুক্কায়িত হইলেন। পাণ্ডবেরা পরদিন তাঁহার

অন্বেষণে ধাবিত হইলেন। অশ্বত্থামা ধরা পড়িয়া আত্মরক্ষার্থ অতি ভয়ঙ্কর ব্রহ্মশিরা অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। অর্জুনও তন্নিবারণার্থ ব্রহ্মশিরা অস্ত্রের প্রতিপ্রয়োগ করিলেন। দুই অস্ত্রের তেজে ব্রহ্মাণ্ডধ্বংসের সম্ভাবনা দেখিয়া ঋষিরা মিটমাট করিয়া দিলেন। অশ্বত্থামার শিরস্থিত সহজমণি কাটিয়া দ্রৌপদীকে উপহার দিলেন। এদিকে ব্রহ্মশিরা অস্ত্র পাণ্ডববধূ উত্তরার গর্ভ নষ্ট করিল।

এই সকল অনৈসর্গিক ব্যাপার আমরা ছাড়িয়া দিতে পারি। আমাদের সমালোচনার যোগ্য কৃষ্ণচরিত্র-ঘটিত কোন কথাই সৌপ্তিক পর্বে নাই।

তার পর স্ত্রীপর্ব। স্ত্রীপর্ব আরও ভীষণ। নিহত বীরবর্গের স্ত্রীগণের ইহাতে আর্তনাদ। এমন ভীষণ আর্তনাদ আর কখনো শুনা যায় নাই। কিন্তু কৃষ্ণসম্বন্ধীয় দুইটি কথা মাত্র আছে।

১। ধৃতরাষ্ট্র আলিঙ্গনকালে ভীমকে চূর্ণ করিবেন, কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহার জন্য লৌহভীম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্ধ রাজা তাহাই চূর্ণ করিলেন। অনৈসর্গিক বৃত্তান্ত আমাদের পরিহার্য। এজন্য এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই।

২। গান্ধারী কৃষ্ণের নিকট অনেক বিলাপ করিয়া, শেষে কৃষ্ণকেই অভিসম্পাত করিলেন। বলিলেন : –

"জনার্দন! যখন কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পরের ক্রোধানলে পরস্পর দগ্ধ হয়, তৎকালে তুমি কি নিমিত্ত তদ্বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে? তোমার বহুসংখ্যক ভৃত্য ও সৈন্য বিদ্যমান আছে; তুমি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বাক্যবিশারদ ও অসাধারণ বলবীর্যশালী, তথাপি, তুমি ইচ্ছাপূর্বক কৌরবগণের বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ। অতএব তোমারে অবশ্যই ইহার ফলভোগ করিতে হইবে। আমি পতিশুশ্রূষা দ্বারা যে কিছু তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, সেই নিতান্ত দুর্লভতপঃপ্রভাবে তোমারে অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে, তুমি যেমন কৌরব ও পাণ্ডবগণের জ্ঞাতিবিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, তেমনি তোমার আপনার জ্ঞাতিবর্গও তোমাকর্তৃক বিনষ্ট হইবে। অতঃপর ষট্‌ত্রিংশৎ* বর্ষ সমুপস্থিত হইলে তুমি অমাত্য, জ্ঞাতি ও পুত্রহীন ও বনচারী হইয়া অতি কুৎসিত উপায় দ্বারা নিহত হইবে।

তোমার কুলরমণীগণও ভরতবংশীয় মহিলাগণের ন্যায় পুত্রহীন ও বন্ধুবান্ধবহীন হইয়া বিলাপ ও পরিত্যাগ করিবেন।”

কৃষ্ণ, হাসিয়া উত্তর করিলেন, “দেবি! আমা ব্যতিরেকে যদুবংশীয়দিগের বিনাশ করে, এমন আর কেহ নাই। আমি যে যদুবংশ ধ্বংস করিব, তাহা অনেক দিন অবধারণ করিয়া রাখিয়াছি। আমার যাহা অবশ্য অবশ্যকর্তব্য, এক্ষণে আপনি তাহাই কহিলেন। যাদবেরা মনুষ্য বা দেবদানবগণেরও বাধ্য নহে। সুতরাং তাঁহারা পরস্পর বিনষ্ট হইবেন।”

এইরূপে দ্বিতীয় স্তরের কবি মৌসল পর্বের পূর্ব সূচনা করিয়া রাখিলেন। মৌসল পর্ব যে দ্বিতীয় স্তরের, তাহারও পূর্বসূচনা আমরাও করিয়া রাখিয়াছি।

------

* ষট্‌ত্রিংশৎ বলেন কেন?

দশম পরিচ্ছেদ—বিধি সংস্থাপন

এক্ষণে আমরা অতি দুস্তর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বিবরণ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। কৃষ্ণচরিত্র পুনর্বার সুবিমল প্রভাসিত হইতে চলিল। কিন্তু শান্তি ও অনুশাসন পর্বে কৃষ্ণ ঈশ্বর বলিয়া স্পষ্টতঃ স্বীকৃত।

যুদ্ধাদির অবশেষে, অগাধবুদ্ধি যুধিষ্ঠির, আবার এক অগাধবুদ্ধির খেলা খেলিলেন। তিনি অর্জুনকে বলিলেন, এত জ্ঞাতি প্রভৃতি বধ করিয়া আমার মনে কোন সুখ নাই—আমি বনে যাইব, ভিক্ষা করিয়া খাইব। অর্জুন বড় রাগ করিলেন—যুধিষ্ঠিরকে অনেক বুঝাইলেন। তখন অর্জুন যুধিষ্ঠিরে বড় ভারি বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। শেষ, ভীম, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও স্বয়ং কৃষ্ণ অনেক বুঝাইলেন। দুর্বলচিত্ত যুধিষ্ঠির কিছুতেই বুঝেন না। ব্যাস, নারদ প্রভৃতি বুঝাইলেন। কিছুতেই না। শেষ কৃষ্ণের কথায় মহাসমারোহের সহিত হস্তিনা প্রবেশ করিলেন।

কৃষ্ণ তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করাইলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের স্তব করিলেন। সে স্তব জগদীশ্বরের। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের স্তব করিয়া নমস্কার করিলেন। কৃষ্ণ বয়ঃকণিষ্ঠ; যুধিষ্ঠির আর কখনও তাঁহাকে স্তব বা নমস্কার করেন নাই।

এদিকে কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম, শরশয্যায় শয়ান, তীব্র যন্ত্রণায় কাতর, উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় শরীর রক্ষা করিতেছেন। তিনি ঋষিগণ-পরিবৃত হইয়া, সর্বময় সর্বাধার, পরমপুরুষ কৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তুতিবাক্যে চঞ্চলচিত্ত হইয়া কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরাদি সঙ্গে লইয়া ভীষ্মকে দর্শন দিতে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে যুধিষ্ঠির উপযাচক হইয়া পরশুরামের উপাখ্যান কৃষ্ণের নিকট শ্রবণ করিলেন।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ অনুমতি করিয়াছিলেন যে, ভীষ্মের নিকট জ্ঞানলাভ কর। ভীষ্ম সর্বধর্মবেত্তা; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্ঞান তাঁহার সঙ্গে যাইবে; তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে সেই জ্ঞান জগতে প্রচারিত হয়, ইহা তাঁহার ইচ্ছা। এই জন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার

নিকট জ্ঞানলাভাদিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ভীষ্মকেও যুধিষ্ঠিরাদিকে ধর্মোপদেশ দিয়া অনুগৃহীত করিতে আদেশ করিলেন।

ভীষ্ম স্বীকৃত হইলেন না। বলিলেন, ধর্ম কর্ম সবই তোমা হইতে; তুমিই সব জান; তুমিই যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান কর। আমি আপনি শরখচিত হইয়া মুমূর্ষু ও অত্যন্ত ক্লিষ্ট, আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইতেছে; আমি পারিয়া উঠিব না। তখন কৃষ্ণ বলিলেন, আমার বরে তোমার শরাঘাতনিবন্ধন সমস্ত ক্লেশ বিদূরিত হইবে, তোমার অন্তঃকরণ জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল হইবে, বুদ্ধি অব্যতিক্রান্ত থাকিবে; তোমার মন কেবল সত্ত্বগুণাশ্রয় করিবে। তুমি দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে ভূত ভবিষ্যৎ সমস্ত দেখিবে।

কৃষ্ণের কৃপায় সেইরূপই হইল। কিন্তু তথাপি ভীষ্ম আপত্তি করিলেন। কৃষ্ণকে বলিলেন, “তুমি স্বয়ং কেন যুধিষ্ঠিরকে হিতোপদেশ প্রদান করিলে না?”

উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন, সমস্ত হিতাহিত কর্ম আমা হইতে সম্ভূত। চন্দ্রের শীতাংশু ঘোষণাও যেরূপ, আমার যশোলাভ সেইরূপ। আমার এখন ইচ্ছা, আপনাকে সমধিক যশস্বী করি। আমার সমুদায় বুদ্ধি সেই জন্য আপনাকে অর্পণ করিয়াছি। ইত্যাদি।

তখন ভীষ্ম প্রফুল্লচিত্তে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মতত্ত্ব শুনাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজধর্ম, আপদ্ধর্ম এবং মোক্ষধর্ম অতি সবিস্তারে শুনাইলেন। মোক্ষধর্মের পর শান্তিপর্ব সমাপ্ত।

এই শান্তিপর্বে তিন স্তরই দেখা যায়। প্রথম স্তরই ইহার কঙ্কাল ও তার পর যিনি যেমন ধর্ম বুঝিয়াছেন, তিনিই তাহা শান্তিপর্বভুক্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আমাদের সমালোচনার যোগ্য একটা গুরুতর কথা আছে। কেবল ধার্মিককে রাজা করিলেই ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল না। আজ ধার্মিক যুধিষ্ঠির রাজা ধর্মাত্মা; কাল তাঁহার উত্তরাধিকারী পাপাত্মা হইতে পারেন। এইজন্য ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়া, তাহার রক্ষার জন্য ধর্মানুমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করাও চাই। রণজয়, রাজ্য স্থাপনের প্রথম কার্য মাত্র; তাহার শাসন জন্য বিধিব্যবস্থাই (Legislation) প্রধান কার্য। কৃষ্ণ সেই কার্যে ভীষ্মকে নিযুক্ত করিলেন। ভীষ্মকে নিযুক্ত করিলেন, তাহার বিশেষ কারণ ছিল; আদর্শ নীতিজ্ঞই তাহা লক্ষিত করিতে পারেন। কৃষ্ণ সেই সকল কারণ নিজেই ভীষ্মকে বুঝাইতেছেন।

"আপনি বয়োবৃদ্ধ এবং শাস্ত্রজ্ঞান এবং শুদ্ধাচারসম্পন্ন। রাজধর্ম ও অপরাপর ধর্ম কিছুই আপনার অবিদিত নাই। জন্মাবধি আপনার কোনও দোষই লক্ষিত হয় নাই, নরপতিগণ আপনারে সর্বধর্মবেত্তা বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। অতএব পিতার ন্যায় আপনি এই ভূপালগণকে নীতি উপদেশ প্রদান করুন। আপনি প্রতিনিয়ত ঋষি ও দেবগণের উপাসনা করিয়াছেন। এক্ষণে এই ভূপতিগণ আপনার নিকট ধর্মবৃত্তান্ত শ্রবণোৎসুক হইয়াছেন। অতএব আপনাকে অবশ্যই বিশেষরূপে সমস্ত ধর্মকীর্তন করিতে হইবে। পণ্ডিতদিগের মতে ধর্মোপদেশ প্রদান করা বিদ্বান ব্যক্তিরই কর্তব্য।"

তার পর অনুশাসন পর্ব। এখানেও হিতোপদেশ; যুধিষ্ঠির শ্রোতা, ভীষ্ম বক্তা। কতকগুলা বাজে কথা লইয়া, এই অনুশাসন পর্ব গ্রথিত হইয়াছে। সমুদয়ই বোধ হয় তৃতীয় স্তরের। তন্মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় কিছু নাই।

পরিশেষে ভীষ্ম স্বর্গারোহণ করিলেন। ইহাই কেবল প্রথম স্তরের।

একাদশ পরিচ্ছেদ—কামগীতা

ভীষ্মের স্বর্গারোহণের পর, যুধিষ্ঠির আবার কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বাহানা লইলেন বনে যাইব। অনেকে অনেক প্রকার বুঝাইলেন। কিন্তু কৃষ্ণ এবার রোগের প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। সেরূপ রোগ নির্ণয় করা আর কাহারও সাধ্য নহে। যুধিষ্ঠিরের প্রকৃত রোগ অহঙ্কার। ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিখায় pride শব্দ অহঙ্কার শব্দের প্রতিশব্দ। বস্তুতঃ তাহা নহে। অহঙ্কার ও মাৎসর্য পৃথক্ পৃথক্ বস্তু। "আমি এই সকল করিতেছি," "ইহা আমার," "এই আমার সুখ" "ইহা আমার দুঃখ," এইরূপ জ্ঞানই অহঙ্কার। এই যুধিষ্ঠিরের দুঃখের কারণ। আমি এই পাপ করিয়াছি—আমার এই শোক উপস্থিত; আমি লইয়াই সব, অতএব আমি বনে যাইব, ইত্যাদি আত্মাভিমানই যুধিষ্ঠিরের এই কাঁদাকাটির মূলে আছে। সেই মূলে কুঠারাঘাতপূর্বক যুধিষ্ঠিরকে উদ্ধৃত করা, এই ধর্মবেত্তৃশ্রেষ্ঠের উদ্দেশ্য। এজন্য তিনি পরুষবাক্যে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "আপনার এখনও শত্রু অবশিষ্ট আছে। আপনার শরীরের অভ্যন্তরে যে অহঙ্কাররূপ দুর্জয় শত্রু রহিয়াছে, তাহা কি আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন না?" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অহঙ্কারকে বিনষ্ট করার সম্বন্ধে একটি রূপক যুধিষ্ঠিরকে শুনাইলেন। তার পর তিনি যুধিষ্ঠিরকে যে অত্যুৎকৃষ্ট জ্ঞানোপদেশ দিলেন, তাহা সবিস্তারে উদ্ধৃত করিতেছি। যে নিষ্কাম ধর্ম আমরা গীতায় পড়ি, তাহা এখানেও আছে। এইরূপ অতি মহৎ ধর্মোপদেশেই কৃষ্ণচরিত্র বিশেষ স্ফূর্তি পায়।

"হে ধর্মরাজ! ব্যাধি দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। ঐ দুই প্রকার ব্যাধি পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীরে যে ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহারে শারীরিক এবং মনোমধ্যে যে পীড়া উপস্থিত হয়, তাহারে মানসিক ব্যাধি কহে। কফ পিত্ত ও বায়ু এই তিনটি শরীরের গুণ, যখন এই তিন গুণ সমভাবে অবস্থান করে, তখন শরীরকে সুস্থ এবং যখন ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখনই শরীরকে অসুস্থ বলা যায়। পিত্তের আধিক্য হইলে কফের হ্রাস ও কফের আধিক্য হইলে পিত্তের

হ্রাস হইয়া থাকে। শরীরের ন্যায় আত্মারও তিনটি গুণ আছে। ঐ তিনটি গুণের নাম সত্ত্ব, রজ ও তম। ঐ গুণত্রয় সমভাবে অবস্থান করিলে আত্মার স্বাস্থ্যলাভ হয়। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে একের আধিক্য হইলে অন্যের হ্রাস হয়। হর্ষ উপস্থিত হইলে শোক এবং শোক উপস্থিত হইলে হর্ষ তিরোহিত হইয়া যায়। দুঃখের সময় কি কেহ সুখানুভব করে এবং সুখের সময় কি কাহার দুঃখানুভব হয়? যাহা হউক, এক্ষণে সুখদুঃখ উভয়ই স্মরণ করা আপনার কর্তব্য নহে। সুখদুঃখাতীত পরব্রহ্মকে স্মরণ করাই আপনার বিধেয়।

* * * পূর্বে ভীষ্ম দ্রোণাদির সহিত আপনার যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে একমাত্র অহঙ্কারের সহিত তাহা অপেক্ষা অধিক ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ যুদ্ধে অভিমুখীন হওয়া আপনার অবশ্য কর্তব্য। যোগ ও তদুপযোগী কার্য সমুদায় অবলম্বন করিলেই এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন। এই যুদ্ধে শরনিকর, ভৃত্য ও বন্ধুবর্গের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; একমাত্র মনকে সহায় করিয়া ঐ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিলে দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। অতএব আপনি আমার এই উপদেশানুসারে অচিরাৎ অহঙ্কারকে পরাজয়পূর্বক শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্তে পৈতৃক রাজ্য প্রতিপালন করুন।

"হে ধর্মরাজ!" কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করা কদাপি সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয় সমুদায়কে পরাজয় করিতে পারিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কি না সন্দেহ। যাহারা রাজ্যাদি বিষয় সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াও মনে মনে বিষয়ভোগের বাসনা করে, তাহাদিগের ধর্ম ও সুখ তোমার শত্রুগণ লাভ করুক। মমতা সংসার-প্রাপ্তির ও নির্মমতা ব্রহ্মলাভের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ বিরুদ্ধধর্মাবলম্বী মমতা ও নির্মমতা লোকসমুদায়ের চিত্তে অলক্ষিতভাবে অবস্থানপূর্বক পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ও পরাজয় করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের অবিনশ্বরতানিবন্ধন জগতের অস্তিত্ব অবিনশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন, প্রাণিগণের দেহনাশ করিলেও তাঁহারে হিংসাপাপে লিপ্ত হইতে হয় না; যে ব্যক্তি স্থাবরজঙ্গমসংবলিত সমুদায় জগতের আধিপত্য লাভ করিয়াও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই সংসারপাপে বদ্ধ হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি অরণ্যে ফলমূলাদি দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিয়াও বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে

না পারে, তাহারে নিশ্চয়ই সংসারজালে জড়িত হইতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয় ও বিষয় সমুদায় মায়াময় বলিয়া নিশ্চয় করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি এই সমুদায়ের প্রতি কিছুমাত্র মমতা না করেন, তিনি নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হন। কামপরতন্ত্র মূঢ় ব্যক্তিরা কদাচ প্রশংসার আস্পদ হইতে পারে না। কামনা মন হইতে সমুৎপন্ন হয়; উহা সমুদায় প্রবৃত্তির মূল কারণ। যে সমুদায় মহাত্মা বহু জন্মের অভ্যাসবশতঃ কামনারে অধর্মরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া ফললাভের বাসনা সহকারে দান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, ব্রত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম, ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় না করেন, তাঁহারাই এককালে কামনারে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। কামনিগ্রহই যথার্থ ধর্ম ও মোক্ষের বীজস্বরূপ, সন্দেহ নাই।

অতঃপর পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ যে কামগীতা কীর্তন করিয়া থাকেন, আমি এক্ষণে তোমার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। কামনা স্বয়ং কহিয়াছে যে, নির্মমতা ও যোগাভ্যাস ভিন্ন কেহই আমারে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি জপাদি কার্য দ্বারা আমারে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে অভিমানরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার কার্য বিফল করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমারে পরাজিত করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে জঙ্গমমধ্যগত জীবাত্মার ন্যায় ব্যক্তরূপে উদিত হই। যে ব্যক্তি বেদান্ত সমালোচনা দ্বারা আমারে শাসন করিতে যত্নবান্ হয়, আমি তাহার মনে স্থাবরান্তর্গত জীবাত্মার ন্যায় অব্যক্তরূপে অবস্থান করি। যে ব্যক্তি ধৈর্য দ্বারা আমারে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি কখনই তাহার মন হইতে অপনীত হই না। যে ব্যক্তি তপস্যা দ্বারা আমারে পরাজয় করিতে যত্ন করে, আমি তাহার তপস্যাতেই প্রাদুর্ভূত হই এবং যে ব্যক্তি মোক্ষার্থী হইয়া আমারে জয় করিতে বাসনা করে, আমি তাহারে লক্ষ্য করিয়া নৃত্য ও উপহাস করিয়া থাকি। পণ্ডিতেরা আমারে সর্বভূতের অবধ্য, ও সনাতন বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।

হে ধর্মরাজ! এই আমি আপনার কামগীতা সবিস্তারে কীর্তন করিলাম। অতএব কামনারে পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। আপনি বিধিপূর্বক অশ্বমেধ ও অন্যান্য সুসমৃদ্ধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কামনারে ধর্মবিষয়ে নীত করুন। বারংবার বন্ধুবিয়োগে অভিভূত

হওয়া আপনার নিতান্ত অনুচিত। আপনি অনুতাপ দ্বারা কখনই তাঁহাদিগেক পুনদর্শন লাভে সমর্থ হইবেন না। অতএব এক্ষণে মহাসমারোহে সুসমৃদ্ধ যজ্ঞ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করুন, তাহা হইলেই ইহলোকে অতুল কীর্তি ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণপ্রয়াণ

ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল; ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে। পাণ্ডবদিগের সঙ্গে কৃষ্ণের জন্য এ গ্রন্থের সম্বন্ধ; মহাভারতে যে জন্য কৃষ্ণের দেখা পাই, তাহা সব ফুরাইল। এইখানে কৃষ্ণের মহাভারত হইতে অন্তর্হিত হওয়া উচিত। কিন্তু রচনাকণ্ডূতিপীড়িতেরা তত সহজে কৃষ্ণকে ছাড়িবার পাত্র নহেন। ইহার পরে অর্জুনের মুখে তাঁহারা একটা অপ্রাসঙ্গিক, অদ্ভুত কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি যুদ্ধকালে আমাকে যে ধর্মোপদেশ দিয়াছিলে, সব ভুলিয়া গিয়াছি। আবার বল। কৃষ্ণ বলিলেন, কথা বড় মন্দ। আমার আর সে সব কথা মনে হইবে না। আমি তখন যোগমুক্ত হইয়াই সে সব উপদেশ দিয়াছিলাম। আর তুমিও বড় নির্বোধ ও শ্রদ্ধাশূন্য; তোমায় আর কিছুই বলিতে চাহি না। তথাপি এক পুরাতন ইতিহাস শুনাইতেছি।

কৃষ্ণ ঐ ইতিহাসোক্ত ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া, অর্জুনকে আবার কিছু তত্ত্বজ্ঞান শুনাইলেন। পূর্বে যাহা শুনাইয়াছিলেন, তাহা গীতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখন যাহা শুনাইলেন, গ্রন্থকার তাহার নাম রাখিয়াছেন, "অনুগীতা"। ইহার এক ভাগের নাম "ব্রাহ্মণগীতা"।

ভগবদ্গীতা, প্রজাগর, সনৎসুজাতীয়, মার্কণ্ডেয়সমস্যা, এই অনুগীতা প্রভৃতি অনেকগুলি ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ মহাভারতের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া, এক্ষণে মহাভারতের অংশ বলিয়া প্রচলিত। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গীতা, কিন্তু অন্যগুলিতেও অনেক সারগর্ভ কথা পাওয়া যায়। অনুগীতাও উত্তম গ্রন্থ। "ভট্ট মোক্ষমূলর," ইহাকে তাঁহার "Sacred Books of the East" নামক গ্রন্থাবলীর মধ্যে স্থান দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্, এক্ষণে যিনি বোম্বাই হাইকোর্টের জজ, তিনি ইহা ইংরাজিতে অনুবাদিত করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থ যেমনই হউক, ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। গ্রন্থ যেমনই হউক, ইহা কৃষ্ণোক্তি নহে। গ্রন্থকার বা অপর কেহ, যেরূপ অবতারণা করিয়া, ইহাকে কৃষ্ণের মুখে উক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, ইহা কৃষ্ণোক্ত নহে; জোড়া দাগ বড় স্পষ্ট, কষ্টেও জোড় লাগে নাই। গীতোক্ত ধর্মের সঙ্গে অনুগীতোক্ত ধর্মে এরূপ কোন

সাদৃশ্য নাই যে, ইহাকে গীতাবেত্তার উক্তি বিবেচনা করা যায়। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ত্র্যম্বক, নিজকৃত অনুবাদের যে দীর্ঘ উপক্রমণিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে সন্তোষজনক প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে, অনুগীতা, গীতার অনেক শতাব্দী পরে রচিত হইয়াছিল। সে প্রমাণের বিস্তারিত আলোচনার আমাদের প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণচরিত্রের কোন অংশই অনুগীতার উপর নির্ভর করে না। তবে, অনুগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা (বা ব্রহ্মগীতা) যে প্রকৃত পক্ষে প্রক্ষিপ্ত, তাহার প্রমাণার্থ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে ইহার কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই।

অর্জুনকে উপদিষ্ট করিয়া, কৃষ্ণ অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরাদির নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক দ্বারকা যাত্রা করিলেন। এই বিদায় মানবপ্রকৃতিসুলভ স্নেহাভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণের মানবিকতার পূর্বে পূর্বে আমরা অনেক উদাহরণ দিয়াছি। অতএব ইহার সবিস্তার বর্ণন নিষ্প্রয়োজন।

পথিমধ্যে উতঙ্ক মুনির সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণ যুদ্ধ নিবারণ করেন নাই, বলিয়া উতঙ্ক তাঁহাকে শাপ দিতে প্রস্তুত। কৃষ্ণ বলিলেন, শাপ দিও না, দিলে তোমার তপঃক্ষয় হইবে, আমি সন্ধিস্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, আর আমি জগদীশ্বর। তখন উতঙ্ক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন। কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলেন; কৃষ্ণও বিশ্বরূপ দেখাইলেন। তার পর জোর করিয়া উতঙ্ককে অভিলষিত বরদান করিলেন। তাহার পর চণ্ডাল আসিল, কুকুর আসিল, চণ্ডাল উতঙ্ককে কুকুরের প্রস্রাব খাইতে বলিল, ইত্যাদি, ইত্যাদি নানারূপ বীভৎস ব্যাপার আছে। এই উতঙ্কসমাগম বৃত্তান্ত মহাভারতের পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে নাই; সুতরাং ইহা মহাভারতের অংশ নহে। কাজেই এ সম্বন্ধে আমাদের কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। স্পষ্টতঃ এখানে তৃতীয় স্তর দেখা যায়।

দ্বারকায় গিয়া কৃষ্ণ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিলিত হইলে বসুদেব তাঁহার নিকট যুদ্ধবৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ যুদ্ধবৃত্তান্ত পিতাকে যাহা শুনাইলেন, তাহা সংক্ষিপ্ত, অত্যুক্তি শূন্য, এবং কোন প্রকার অনৈসর্গিক ঘটনার প্রসঙ্গদোষরহিত। অথচ সমস্ত স্থূল ঘটনা প্রকাশিত করিলেন। কেবল অভিমন্যুবধ গোপন করিলেন। কিন্তু সুভদ্রা তাঁহার সঙ্গে

দ্বারকায় গিয়াছিলেন, সুভদ্রা অভিমন্যুবধের প্রসঙ্গ স্বয়ং উত্থাপন করিলেন। তখন কৃষ্ণ সে বৃত্তান্তও সবিস্তারে বলিলেন।

এদিকে যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণের বিদায়কালে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, অশ্বমেধ যজ্ঞকালে পুনর্বার আসিতে হইবে। এক্ষণে সেই যজ্ঞের সময় উপস্থিত। অতএব তিনি যাদবগণ পরিবৃত হইয়া পুনর্বার হস্তিনায় গমন করিলেন।

কৃষ্ণ তথায় আসিলে, অভিমন্যুপত্নী উত্তরা একটি মৃত পুত্র প্রসব করিলেন। কৃষ্ণ তাহাকে পুনর্জীবিত করিলেন। কিন্তু ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, কৃষ্ণ ঐশী শক্তির প্রয়োগদ্বারা এই কার্য সম্পাদন করিলেন। এখনকার অনেক ডাক্তারই মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে পুনর্জীবিত করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন এবং কিরূপে করিতে পারেন, তাহা আমরা অনেকেই জানি। ইহা দ্বারা কেবল ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, তাহা তখনকার লোক আর কেহ জানিত না, কৃষ্ণ তাহা জানিতেন। তিনি আদর্শ মনুষ্য, এজন্য সর্বপ্রকার বিদ্যা ও জ্ঞান তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল।

তার পর নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। কৃষ্ণও দ্বারকায় পুনরাগমন করিলেন। তার পর আর পাণ্ডবগণের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই।